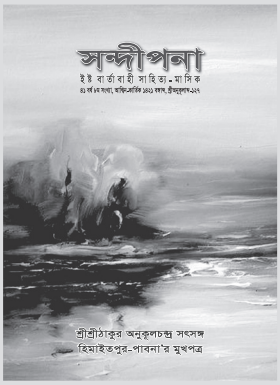

সম্পাদক
ড. শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার

নির্বাহী সম্পাদক
শ্রীজগদীশচন্দ্র দেবনাথ

সম্পাদনা সহযোগী
শ্রীতাপসকুমার রায়
tapas.satsang@gmail.com
tkroy@rocketmail.com

ঢাকা কার্যালয়
১৪০/১ শাঁখারী বাজার
ঢাকা-১১০০।

চট্টগ্রাম কার্যালয়
২৭ দেওয়ান্‌জী পুকুর লেন
রহমতগঞ্জ, চট্টগ্রাম।
ফোনঃ ০৩১-২৮৬০৭১১
মোবাইল: ০১৭১৪-৩১০২০৩
০১৮১৯-৩১২৫১৮

প্রধান কার্যালয়
শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ
হিমাইতপুর-পাবনা
ফোনঃ ০৭৩১-৬৫৫২৩, ৬৫১৬৪
মোবাইলঃ ০১৭১৫-৫৩৪২০৭ (সম্পাদক)
০১৯১১-৭৮৮১৩৯ (সম্পাদনা সহযোগী)
০১৭১৮-১৫২৩৪৪ (অফিস)
E-mail: satsanghimaitpur@yahoo.com

বাণিজ্যিক যোগাযোগ
শ্রীঅনিশচন্দ্র ঢালী
০১৭১৯-৭৫৩৪৭৪

প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠা সজ্জা
আমিনুল ইসলাম
প্রিন্ট মিডিয়া, প্রেসপট্টি, বগুড়া

সন্দীপনা

ই ষ্ট বা র্তা বা হী সা হি ত্য - মা সি ক

৪১ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, আশ্বিন-কার্তিক-১৪২১ বঙ্গাব্দ, সেপ্টেম্বর-নভেম্বর'১৪ খ্রিঃ, শ্রীঅনুকূলাব্দ ১২৭

যদি কেউ সৎ-সাত্ত্বিকভাবেই হো'ক
বা সুচাহিদার দরুনই হো'ক
তোমাকে কিছু দেয় বা দিতে স্বীকার করে,
ঐ দেওয়া বা স্বীকারকে অবলম্বন ক'রে
প্রথমেই তা'কে কৃতজ্ঞ ধন্যবাদে
ফুল্ল অভিব্যক্তিতে
প্রসাদ-উদ্দীপ্ত ক'রে তোল–
বাক্যে, ব্যবহারে ও সম্ভ্রান্ত অনুচর্য্যায়,–
যা'তে তোমার ঐ উৎফুল্ল আবেগ
তা'কে তোমার প্রতি অন্তরাসী ক'রে
সম্বেগোদ্দীপ্ত ক'রে তোলে,
আর, এই করার ভিতর-দিয়ে
আপ্যায়িত উদ্বুদ্ধ অনুপ্রেরণায়
অনুপ্রাণিত ক'রে তোল তা'কে,
যা'তে তোমাকে দিয়েও
মানুষ সশ্রদ্ধ আত্মপ্রসাদে ফুল্ল হ'য়ে ওঠে। (সদ্‌বিধায়না-১১৩)

–শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

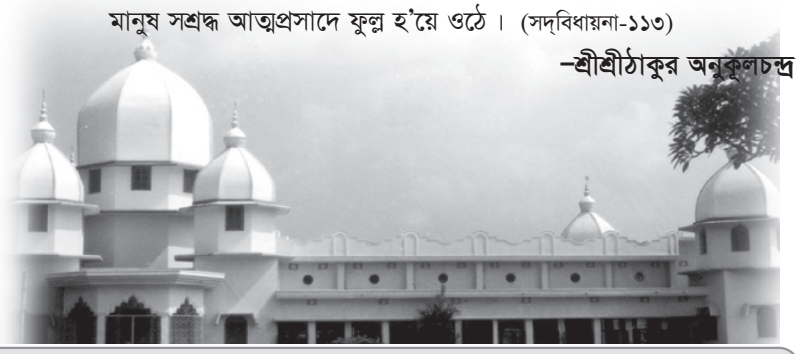

সূচিপত্র

দিব্যবাণী ঃ শ্রীশ্রীঠাকুর ৪
ছন্দে ছড়ায় জীবন আলো ঃ শ্রীশ্রীঠাকুর ৬
মাতৃদীপনা- সেবা-বিধায়না ঃ শ্রীশ্রীঠাকুর ৮
প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ১০
বাসনা ইচ্ছা মঙ্গল ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪
যুগপ্রেক্ষণায় অনুকূল-সাহিত্য ঃ ড. প্রজ্ঞারঞ্জন দত্ত ১৬
ওস্যান ইন এ টি-কাপঃ অনুবাদঃ শ্রীমতি ছবি গোস্বামী ২০
ফিরিয়ে আনতে হবে তপোবন শিক্ষা ঃ স্বামী মৃগানন্দ ২৪
মানসতীর্থ পরিক্রমা ঃ সুশীলচন্দ্র বসু ২৭
আত্মস্মৃতি নিজ জীবন প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর ৩০
শ্রীশ্রীঠাকুরের দৃষ্টিতে "কু-বিবাহ রাষ্ট্রোন্নয়নের পরিপন্থী" ঃ ড. শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার ৩৩
ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় সৈনিক, মহান মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক কালের সাক্ষী, বিমল রায় চৌধুরী ঃ প্রণব দাস ৩৯
শ্রীশ্রীঠাকুর কথিত শব্দের ব্যাখ্যা ৪১
চিরঞ্জীব বনৌষধী– ছিলি হিন্ট ঃ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য্য ৪৩
গান/কবিতা ৪৫
সৎসঙ্গ সমাচার ৪৬
প্রার্থনার সময় সূচী ৪৮

অনলাইনে 'সন্দীপনা' পড়তে ভিজিট করুন–
www. srisrithakuranukulchandrasatsang.com/pages/publications

সম্পাদকীয়

"উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে" -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'সন্দীপনা'র বর্তমান সংখ্যাটি 'আশ্বিন-কার্তিক' যুগ্ম সংখ্যা শিরোনামে প্রকাশ হলো। আমাদের 'শৈথিল্য-পরিভৃত' অপটু চলনের আরও একটি দৃষ্টান্ত স্থাপিত হলো বৈকি! আমাদের বোধশক্তি ও জীবন চেতনায় কর্ম-শৈথিল্যের ধারাটি ক্রমশ মজ্জাগত হয়ে যাচ্ছে নাকি? এর জবাব একটাই। সময়ের কাজ সময়ে শেষ করার দৃঢ় সংকল্পে আমরা ব্রতী হতে চাই। ব্যর্থতার বেফাঁস দঙ্গল ঠেলে আমরা শুভ সুন্দর ও অগ্রগতির সরণি বেয়ে জীবনের জয়গান গেয়ে উঠতে চাই। প্রভুর অপার দয়ায় আমরা তা পারবোই। আর, সেজন্য দরকার ঢিলেঢালা রকমে চলাটা পরিহার করা।

একটু ক'রে ধীর-চলনে
হয় না অভ্যাস এস্তামাল,
অমনতর চললে বাড়েই
মনে ব্যর্থ বেফাঁস কু-জঞ্জাল,
যা' করবি তুই, বুঝলে মনে
এক ঝাঁকিতে কর তাহা,
সমানে চল সেই চলনে
এমনি চলাই ঠিক রাহা।'
– শ্রীশ্রীঠাকুর

করণীয় যা তা এক্ষুণি বা তাৎক্ষণিক সম্পাদনের তাগাদা ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের। রুটিন মাফিক চলার উপকারিতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন– "রুটিন করা মানে পথের হিসাব করে চলা। কোথায় কী করব, তারপরে কী করব, এসব হিসাব-নিকাশ করে চলা। কিন্তু এই যেমন সকালে উঠে চা খাব, পায়খানায় যাব, দাত মাজব, তারপরে অমুকের সাথে আলাপ করব বা কোথাও যাব, কেবল এইগুলি ঠিক রাখাকেই রুটিন কয় না। করণীয় ব্যাপারগুলি ঠিকমত করাও রুটিনের মধ্যে।" (–শ্রীশ্রীঠাকুর, দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড।)

প্রভুর নির্দেশ হল, করণীয় যা তা যথাসময়ে বাস্তবে রূপায়িত করা। আমাদের চরিত্রে, আচরণে তথা সত্তায় যেন ইষ্টনির্দেশ পালনে কিছুমাত্র শৈথিল্য না থাকে। তবেই আমরা চলায়, করায় সার্থকতার পথ খুঁজে পাব। সন্দীপনার সময়োচিত প্রকাশেও একই কথা প্রযোজ্য। বিলম্বে প্রকাশের জন্য কোন কৈফিয়ত নয়, আমরা নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

আশ্বিন মাসের ১২ থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হলো। সারাদেশে উৎসবকে ঘিরে ছিল নানা আয়োজন। ভক্তি-বিনম্র চিত্তে দেবী দুর্গার কাছে ভক্ত-অনুরাগিরা দুর্গতিনাশের প্রার্থনা জানিয়েছেন। জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত-বেদনা ভুলে সবাই উৎসবের আমেজে ছিলেন মাতোয়ারা। শ্রীশ্রীঠাকুর দুর্গা পূজার প্রাক্কালে অনেক বাণী দিয়েছেন। এসব বাণীতে দেবী দুর্গার মাহাত্ম্য, বিজয়া ইত্যাদি প্রসঙ্গ ফিরে-ফিরে এসেছে। আদ্যা-শক্তির নানা রূপ বৈচিত্রের সাথে আমাদের বাস্তব জীবনের কী সম্পর্ক তাও উম্মোচিত হয়েছে। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ২৫ অক্টোবর শুভ-বিজয়া উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর যে আশীর্বাণী প্রদান করেন তার কিয়দংশ নিম্নরূপ–

"মায়ের পূজা হল–

এই-ই তো সেই নন্দনার বিজয়-উৎসব
তাই মা আমার আনন্দময়ী;
বিজয়া মায়ের বিলয় নয়কো, বিসর্জন,
বিসর্জন মানেই হচ্ছে বিশেষ বিসৃষ্টি;
যে মৃন্ময় মূর্তি আমরা পূজা করি
কল্পনায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে,

তিনি দশভূজা দশপ্রহরণধারিণী,
ঐ আমাদের মায়েরই প্রতীক–
আমাদের ঘরে-ঘরে
যে মা অধিষ্ঠিতা
তাঁরই বিনায়িত সু-সঙ্গত প্রতীক;
তাই ঐ মায়ের পূজা মানেই হচ্ছে–
যে মা আমার, যে মা তোমার,
যে মা ঘরে-ঘরে দুর্গা হয়ে অধিষ্ঠিতা,
দুর্গতিনাশিনী হয়ে
দশপ্রহরণ ধারণ করে
সন্তান সংরক্ষণায় নিয়োজিতা,
সেই মায়েরই পূজা;
তাই বলি– প্রতি ঘরে-ঘরে
নবীন উদ্যমে
আনন্দের নবীন উৎসর্জনায়
নিষ্ঠার নিনঢ় সংস্থিতি নিয়ে
ঐ মায়ের পূজা নিরত হও;
..... ।"

আমাদের ঘরে-ঘরে যে মা আছেন তাঁর নিয়ত পরিচর্যায়, সম্বর্ধনায়, সেবায় নিরন্তর নিযুক্ত থাকার মধ্যেই আছে দেবী উপাসনার সার্থকতা। "প্রত্যেকের মা-ই জগজ্জননী, প্রত্যেক মেয়েই নিজের মায়ের বিভিন্ন রূপ– এমনতর ভাবতে হয়।" (–শ্রীশ্রীঠাকুর, সত্যানুসরণ)। তাই প্রতিমা পূজার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের বিষয়টি যেন আমাদের প্রতি-প্রত্যেকর অন্তরে জাগরুক থাকে– বিজয়ার শুভ দিনে এই হোক আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

বর্ষার জল কার্তিকে সরে গিয়ে প্রকৃতিতে নেমে এসেছে শান্ত সজীবতা। অতীতে দেশের উত্তরাঞ্চলে এই সময়ে চরম খাদ্যাভাব দেখা দিত। আশার কথা, 'কার্তিকের মঙ্গা' নামে এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি এখন আর দেশে নেই। আগাম ফলনশীল আমন ধানের উদ্ভাবন ও প্রচলনে এখন অভাবী মঙ্গা আর তার করাল থাবা বিস্তার করে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করতে পারে না। নিত্য-নতুন উদ্ভাবন ও আবিষ্কার আমাদের ভবিষ্যৎ চলার পথকে আরও সুন্দর ও প্রাণবন্ত করে তুলুক, সৎসঙ্গের শান্তির পতাকা সকল অন্যায়-অশান্তি বিদূরিত করে সমুন্নত থাকুক– পরমপিতার কাছে এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

দিব্যবাণী
(বিধি-বিন্যাস)
–শ্রীশ্রীঠাকুর

শ্রেয়কেন্দ্রিকতা যেখানে যত শ্লথ
অর্থাৎ সক্রিয় নয়কো,–
প্রবৃত্তির প্রভাব সেখানে তত বেশী,
অপরাধপ্রবণতাও সেখানে তেমনতর। ২৯২।

যখনই দেখছ, পাঁচ মাথা
একবুদ্ধিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠেনি,
তা'র মানেই হ'চ্ছে–
এই পাঁচে কোন বোধি
সর্ব্বসঙ্গতি লাভ করেনি–
উপায়ে, উদ্দেশ্য ও আদর্শে;
তা'র মানেই–
সফলতায়
বিপত্তিকে অনুমান ক'রতে পার। ২৯৩।

নিজ বা নিজের যা'
তা'র বিপদাশঙ্কা থেকে আসে ভয়,
প্রীতি বা স্নেহের পাত্র যা'রা তা'রা কষ্ট পাবে
এই আশঙ্কা থেকে আসে আতঙ্ক–
যা'র প্রতিক্রিয়ায়
নিজেরই কষ্টের উদ্ভব হ'য়ে থাক। ২৯৪।

মমতা-অভিভূতি মানুষকে
দুশ্চিন্তাপরায়ণ ক'রে তোলে,
মমত্ব-সন্দীপনা মানুষকে শুভদর্শী
নিরাকরণ-প্রয়াসী ক'রে তোলে। ২৯৫।

মমতা ক্রূর হ'য়ে ওঠে
উৎসের প্রতি তখনই–
যখনই তা'র আশ্রয়-অবলম্বন যা'রা
তা'রা তা'কে শরীরে, মনে, সত্তায়
পোষণ না দিয়ে
অবজ্ঞায় অবদলিত ক'রে
নিষ্ঠুর ও নিঃসংস্থা হ'য়ে চলে। ২৯৬।

মানুষের মমত্ব-অভিনিষ্যন্দী হৃদয়
বিরক্ত ব্যথিত
বা বেদনাপ্লুত হ'য়ে ওঠে তখনই–
যখনই কেউ
অন্যায্য বা অলীক সন্দেহে
তা' হ'তে বেদনা-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ওঠে,
বা তা'র প্রীতিকে
অবজ্ঞা বা প্রতারণা করে,
এবং স্বার্থান্বিত সমর্থন ও প্রতিষ্ঠা প্রয়াস নিয়ে
নন্দিত করা দূরে থাকুক
স্বার্থগৃধ্নু তার বিবেক-অনুচর্য্যায়
তা'কে আঘাত হেনেই চলে;
তাই, মমতা-নিবদ্ধই যদি হ'তে চাও
নজর রেখো ওগুলিতে,–
নয়তো বেদনা পাবে। ২৯৭।

যে-ঔদার্য্য বা সত্য
সত্তা-বিধ্বংসী
গণ-বিপর্য্যয়ী
কৃষ্টি, বৈশিষ্ট্য ধর্ম্ম-সংঘাতী–
তা'র অভিব্যক্তি
যে ব্যক্তি, নীতি বা বিবেকের
ভিতর-দিয়েই হো'ক না কেন,
তা' কিন্তু প্রবৃত্তি-অভিভূত ব্যামোহ;
তাই, তোমার ঔদার্য্য বা সত্যনিষ্ঠা যদি
লোকবর্দ্ধনী ও লোকহিতী না হয়,
নিরোধ বা নিয়ন্ত্রণকুশল না হয়,
যথার্থ হ'লেও
তা' ধর্ম্ম বা ন্যায়ের কুৎসিত সঞ্চরণ–
জাহান্নামেরই ডাইনী আকর্ষণ–
আত্মঘাতী উদাত্ত মন্ত্র–
মৃত্যু–মথিত মিথ্যার কুহক-সঙ্গীত। ২৯৮।

যা'-কিছু ক'রেছ
সে-সবগুলিই তোমার মাথায়
রেখাপাত ক'রে রেখেছে
আর, তা' হ'তে যে-ব্যুৎপত্তি জন্মেছে
অজানায় অসাড় হ'য়ে
সেগুলি তোমাকে সঞ্চালিত ক'রে চ'লেছে,

আর, এই রকমই তা'রা ক'রতে থাকবে–
যতক্ষণ-না সক্রিয় ও সুকেন্দ্রিক হ'য়ে
তুমি কা'রও নিয়ন্ত্রণে
নিয়ন্ত্রিত না হ'চ্ছে,
ইষ্টানুগ চলনই
তোমার পক্ষে
সত্তাপোষণী চলন । ২৯৯ ।

মানুষের মস্তিষ্কলেখা
যেমনতর আগ্রহ-অভিভূতি নিয়ে
নিবদ্ধ থাকে–
কপাল বা অদৃষ্টও তা'দের তেমনতরই,
স্বভাব, চলন, চরিত্র, আচার-ব্যবহার
সেই পরিচর্য্যানিরত হ'য়েই চলে;
তাই, স্বভাব তা'র বোধিতাৎপর্য্য নিয়ে
যা'তে যেমনতর সক্রিয়–
কপালও তার তেমনিই । ৩০০ ।

যখনই দেখছ–
সোজা কথা, সোজা বুঝ
বা সহজ যুক্তিযুক্ত যা'
তা' বুঝতে পারছ না–
তা' স্থূলই হো'ক আর সূক্ষ্মই হো'ক,
প্যাঁচোয়া ঘুরপাক-দেওয়া জাবড়া
আকাশ কুসুমবৎ অবোধ্য যা'-কিছু–
যা' ধারণও করা মুস্কিল
বা কল্পনাতেও ঠাঁই পায় না,
তা' বোঝ বা না-বোঝ
বেশ বুঝে যা'চ্ছ,
এটা কিন্তু সেই লক্ষণ–
তোমার মস্তিষ্কের বোধিতাৎপর্য্য
কেন্দ্রহারা, জড়োয়া ও বিকৃতিপ্রাপ্ত,–
পাণ্ডিত্য তোমার বেকুবির আসন
অধিকার ক'রে ফেলেছে;
যদি বাঁচতে চাও
বিহিত যা' তা'ই কর,
নয়তো ভুয়াবাজির ভুয়া পাণ্ডিত্যে
ভুয়া স্বর্গ হ'তে বঞ্চিত হওয়া
সুকঠিন হবে । ৩০১ ।

যে-ব্যবস্থাতেই ব্যবস্থ হ'য়ে চল না কেন–
তা' বৈধীই হো'ক
আর ব্যতিক্রমীই হো'ক–
তোমার মস্তিষ্কলেখায়
তা' কিন্তু অবস্থানই ক'রবে
জীয়ন্ত অনুপ্রেরণায়–
স্মৃতিচর্য্যা নিয়ে–
অন্ততঃ ততদিন পর্য্যন্ত
যতদিন তুমি জীবিত আছ
এবং তোমার শরীর ও মনকে
তদনুপাতিক অনুপ্রেরিত ক'রতে থাকবে
সুযোগ ও সুবিধামত–
তা' সুশৃঙ্খলভাবেই হো'ক আর বিশৃঙ্খলাতেই হো'ক
আজীবন তোমার
তা'র তাঁবেদারি ক'রতেই হবে
যেন-তেন প্রকারে–
যতদিন না তুমি
শ্রেয়ার্থে অন্তরাসী হ'য়ে
তৎস্বার্থপরায়ণতায়
তোমার ভালমন্দ যা'-কিছুকে
সার্থক সক্রিয়তায়
নিয়ন্ত্রণনিবদ্ধ ক'রে তুলতে না পারছ
সুষ্ঠু, সার্থক পর্য্যায়ে;
তা'র তাৎপর্য্য এই–
তোমার সু-ই থাক আর কু-ই থাক
তা' ইষ্টার্থনিবদ্ধ হ'য়ে
তাঁকে উপচয়ী ক'রে
সমন্বয়ী সামঞ্জস্যে
যা-কিছু ব্যতিক্রমের সুসমাবেশে
শুভপ্রসূই হ'য়ে উঠবে–
এ কিন্তু সব ব্যাপারেই;
যেমন, কোন বিধবা রমণী বা ব্যভিচারিণী
কোন শ্রেয়পুরুষে
নিবাহ-নিবদ্ধতায়
তৎসার্থকতায় স্বার্থান্বিতা হ'য়ে
তাঁ'কে উপচয়ী ক'রবার জন্য
নিজের জীবনের যা'-কিছুকে
যদি নিয়ন্ত্রিত ক'রতে পারে,
সে ঐ ব্যতিক্রমেও
শুভ-জীবনের অধিকারিণী হ'তে পারে;
তাই ব'লে, ঐ ব্যতিক্রম কিন্তু ব্যতিক্রমই–
যদিও তা' মন্দের ভাল । ৩০২ ।

ছন্দে ছড়ায় জীবন আলো

(অনুশ্রুতি ২য় খণ্ড)

–শ্রীশ্রীঠাকুর

ব্রহ্মদ্যুতিই আত্মপ্রসাদ
কৃতিদীপ্ত উৎসারণ,
নিষ্পাদনী অনুচর্য্যায়
হৃদয়ে হয় সংস্থাপন । ৫৫ ।

ব্রহ্ম জানিস্ বৃদ্ধি-বিধি
চলন-উৎস সবটা নিয়ে,
ঐটে জানাই ব্রহ্মবিদ্যা
বৈশিষ্ট্যেরই বোধন দিয়ে । ৫৬ ।

ব্রহ্মজ্ঞানই বর্দ্ধনার জ্ঞান
বাস্তবে নে খেটে-খুটে,
ব্রহ্মদ্যুতি উর্জ্জী বেগে
কৃতিমুখর হোক্ রে ফুটে । ৫৭ ।

তোমার দরদ তোমার কাছে
যেমনতর মুখ্য হয়,
সবার দরদ অমনি তোমায়
ব্রাহ্মী বোধে সংস্থাপয় । ৫৮ ।

সব যা'-কিছুর অনুকম্পা
দীপ্ত-দীপন উছল রাগে,
সুবিন্যাসে সংস্থিতি পায়–
ব্রাহ্মীরূপে সে-জন জাগে । ৫৯ ।

রূপ দেখ আর জ্যোতিই দেখ
নক্ষত্র আর সূর্য্য-চাঁদ,
বাস্তবতার প্রাজ্ঞ বোধই
ঠিক জানিস্ তা'ই ব্রাহ্মী ছাঁদ । ৬০ ।

ব্রহ্ম বিদ্যা জানলি নে তুই
সিদ্ধ বিধি জানবি কী?
সব বিশেষের তাল পাকিয়ে
ঢালবি শুধু ছাইয়ে ঘি? ৬১ ।

জগৎ-বিভব-কেন্দ্র যেটা
ব্যষ্টি-সমষ্টি সব নিয়ে,
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য যা'
ব্রহ্ম জানিস তা'ই দিয়ে । ৬২ ।

বাস্তববোধ যেমনতর
সংস্থিতির সঞ্চয়নে,
কৃতিমুখর তৎপরতায়
ব্রাহ্মী বোধ তো তা'তেই আনে । ৬৩ ।

ব্রাহ্মী বোধটি যেমন জাগে
যা'র অন্তরে যেমনতর,
ব্রাহ্মীরূপেও তেমনি তাহার
প্রজ্ঞাটিও তেমনি দড় । ৬৪ ।

একই ব্রহ্ম সব-কিছুতে
বিশেষরূপে বিশেষ স্থানে,
এই বিশেষের মিলন-দোলায়
শ্রেয় ফোটে বিশেষ প্রাণে । ৬৫ ।

বৃদ্ধি-বিধি কোথায় কেমন
কী রূপ নিয়ে চলে,
ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাজ্ঞ বোধির
গোড়াই একে বলে । ৬৬ ।

যিনিই করেন কোন-কিছুর
প্রণয়নে সুমূর্ত্তনা,
সে-স্থলেতে তিনিই ব্রহ্মা
সৃজনই তাঁর আরাধনা । ৬৭ ।

বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবণতা
ব্রহ্মে সুপ্ত হ'য়েই থাকে,
অনুষ্ঠানের অনুক্রিয়ায়
ব্রহ্মাই দেন জাগিয়ে তা'কে । ৬৮ ।

একের মাঝে বহু দেখে
বহুতে দেখে এক,
চাল-চরিত্রও তেমনতর
ব্রাহ্মী তনু দেখ্ । ৬৯ ।

নিজের ভেতর প্রত্যেককে দেখে
প্রত্যেকেতে দেখে নিজ,
বোধ-বিবেকের বিন্যাস-সহ,–
ব্রহ্মদর্শীর এই তো বীজ । ৭০ ।

অন্তঃস্যূত বিশ্বরেতঃ
সংগর্ভিত রয় যেখানে,
ঊর্জ্জনাশীল উৎসর্জ্জনার
ব্রাহ্মী-কেন্দ্রেই রয় সেখানে । ৭১ ।

ব্রহ্মজ্ঞানের ভান করিস্ নে
বোধচক্ষুতে দেখ্ তা'রে
সমাধানের সার্থকতায়
কোথায় কিসে কী রূপ ধরে । ৭২ ।

ব্রহ্মানন্দ বড় আনন্দ
জানিস্ কেন তা'?
তুমি সবায়, সব যে তোমায়
স্ফূর্ত্ত স্বাধীনতা । ৭৩ ।

শাণিত-সম্বেগী দৃষ্টি নিয়ে
বৃদ্ধিকে দেখ্ বিভব-সহ,
অমনি ক'রেই ব্রহ্মজ্যোতি
জ্ঞানের চোখে গুণে লহ । ৭৪ ।

ব্রহ্মজ্যোতির দৃষ্টিই তো ঐ
বৃদ্ধিপ্রথা বোধে আনা,
লাখ্ আলোতে ভাসলেও কিন্তু
পড়বে নাকো ওতে হানা । ৭৫ ।

সুখদুঃখের কোলাকুলি
দেখায়-শুনায় চলছে যত,
সমাধানী সংগ্রথনে
ব্রহ্মী বর্দ্ধন হয় নিয়ত । ৭৬ ।

সবাই যখন তোমার হ'য়ে
তোমার মাঝে করে বাস,
তেমনি তুমি তা'দের হ'য়ে
হ'য়ে ওঠে তা'দের শ্বাস;
ব্রহ্মত্বেরই ঐটি হ'ল
ব্যাপ্তিপ্রসূ অঢেলরূপ,
ঐ ব্যাপনী বোধ নিয়ে হয়
'তুমি' তা'রই প্রতীক ভুপ । ৭৭ ।

আকাশ-বাতাস-জল-মাটি আর
স্থাবর-জঙ্গম সব মিলিয়ে
জীবন-দীপন শব্দ অঢেল
ব্রহ্ম কেমন দেখ্ বিনিয়ে । ৭৮ ।

সব যা'-কিছুরই মূল সূত্রটি
প্রাজ্ঞবোধে আসবে যেই,
ব্রহ্মবোধের থাকবি তটে–
ব্যাপন-ব্রহ্মের সূত্র সেই । ৭৯ ।

নেতি-ইতি যা'ই করিস্ না
বাস্তব প্রাজ্ঞ না হ'লে তা'তে,
ব্রহ্মদ্যুতির সামান্য সূত্র
পাবি কি তুই আছে যা'তে? ৮০ ।

বাচক জ্ঞানী তর্কবাগীশ
যতই কেন হও না তুমি,
প্রজ্ঞা ছাড়া যায় না ধরা
এক উপাদান ব্রহ্মভূমি । ৮১ ।

প্রাজ্ঞ দেহ যে-জনই পা'ক্
মূর্ত্ত ব্রহ্ম তাঁ'রেই জানিস্ ।
পুণ্য প্রজ্ঞা দেখবি যাঁ'দের
ব্রাহ্মী দেহ তাঁ'দের মানিস্;
বাস্তবতার প্রতীক ধ'রে
তাঁ'রাও কিন্তু এ সংসারে,
দেব-আখ্যায় আখ্যায়িত,–
লোকে তাঁ'দের পূজা করে । ৮২ ।

ব্রাহ্মী তনু যাঁ'দেরই হয়
জ্ঞানে-গুণে-ব্যবহারে,
তাঁ'তেই হ'য়ে অভিষিক্ত
হও বরেণ্য এ সংসারে । ৮৩ ।

মূল উপাদান যা'-কিছু যা'র
বিশেষ হ'য়েও নির্ব্বিশেষে,
আতিপাতি সব বিনিয়ে
জান না তা'কে–সেই অশেষ । ৮৪ ।

গুণান্বিত শক্তি যা' সব
গুণান্বয়ী সমাধান,
সমাধানে দাঁড়িয়ে যেটা
সেই-ই সবার স্থিতি-আধান । ৮৫ ।

মাতৃদীপনা

(মায়েদের জন্য বিশেষ সাহিত্য আসর)

সেবা বিধায়না

–শ্রীশ্রীঠাকুর

ততই তোমাকে সাহায্য ক'রতে
হস্ত প্রসারণ ক'রে চলবে–
প্রায়শঃই তা' দেখতে পাবে;
তাই, তুমি মানুষের প্রতি যা' কর না,
তেমনতর পাওয়ার প্রত্যাশা
একটা ভূতুড়ে আত্মাপ্রতারণা ছাড়া
আর কিছুই নয়কো। ২৩১।

আর্ত্ত যা'রা, দুঃস্থ যা'রা
রুগ্ন যা'রা, মুমূর্ষ যা'রা
বুভুক্ষ যা'রা–
এগিয়ে চল তা'দের কাছে,
আশার বাণীতে
প্রাণশক্তিকে
দৃপ্ত ক'রে তোল,
তা'দের অবসন্ন দেহকে অঙ্কে তুলে নাও,
তড়িৎ-দক্ষতায় ক্ষিপ্র-চকিতে
এমন ব্যবস্থিতির সমাবেশ কর–
যা'তে তা'রা প্রাণ পায়,
উঠে দাঁড়াতে পারে,
যত পার, মৃত্যুর করাল ছায়াকে সরিয়ে দিয়ে
জীবনের আলোকপাত ক'রে
দীপন সৌজন্যে
মমত্বের উদগাতা হ'য়ে
তৃপ্তি সিঞ্চন কর তা'দের অন্তরে
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ-অনুরঞ্জনায়,
বাঁচাও, প্রাণবান্ ক'রে তোল তা'দের–
যা'র যেমন প্রয়োজন
তেমনি পরিপোষণ দিয়ে,
তোমার পরিস্থিতিকেও
ঐ ব্রতে উদ্দীপ্ত ক'রে তোল,
তা'রাও যেন তোমার মত
উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে–
সক্রিয় কর্ম্ম-তৎপরতায়
একটা সমবায়ী শক্তিদীপনায়,
হাসি ফুটাও তা'দের বুকে–
প্রাণ-পরিচর্য্যায় জীয়ন্ত ক'রে
শরীরে, মনে, জীবনে
সামর্থ্যের সঞ্চার ক'রে তোল,
সঙ্গে-সঙ্গে ইষ্টানুগ বোধন-তৎপরতায়
যোগ্যতায় যুক্ত ক'রে তোল,
একটা স্বাবলম্বী, সহযোগী
সানুকম্পী, সক্রিয় অনুকম্পনায়–
এমনি ক'রেই প্রতিপদে
তোমার সেবা যেন
সার্থকতামণ্ডিত হ'য়ে ওঠে,
দুটো অন্নজল দিয়েই
তোমার সেবাব্রতকে
সাঙ্গ ক'রে তুলো না ওখানেই,
তা'দের জীবনের অধিকারী ক'রে তোল,
যোগ্যতার অধিকারী ক'রে তোল,
উপচয়ী শ্রম-তৎপরতায়
সামর্থ্যবান্ ক'রে
সম্পদের অধিকারী ক'রে তোল,
তুমি সবারই স্বার্থ হ'য়ে দাঁড়াও,
প্রাণবন্ত, সহৃদয়ী, সক্রিয়-সেবামুখর
আচার, ব্যবহার, ভাব-ভঙ্গীতে–
শ্রদ্ধাবনত অন্তরে
প্রতিপ্রত্যেককেই তা'রা যেন
তোমারও স্বার্থ হ'য়ে ওঠে,
প্রিয়পরম
আশিস্-উচ্ছলায়
আবির্ভূত হউন তোমার অন্তরে। ২৩২।

তুমি শ্রেয়সন্দীপী সুকেন্দ্রিক অনুকম্পী
অনুবেদনা নিয়ে
যদি কা'রও কোন উপকার কর,
সেই যে তোমার উপকার ক'রবে–

উপকৃত হ'য়ে,
তা' কিন্তু নাও হ'তে পারে,
কারণ, যা'র উপকার ক'রছ,
যে তোমাকে-দিয়ে উপকৃত,
তা'র আত্মনিয়মনী সম্বেগ,
যা' দিয়ে মানুষের অন্তঃকরণে
আগ্রহের উদ্দীপ্তি হ'য়ে ওঠে,
যে-উদ্দীপনা প্রতিক্রিয়ায়
উপকারীর উপকার ক'রতে
মানুষকে আগ্রহ-উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে–
তা' তা'র নাও থাকতে পারে;
কিন্তু তোমার অন্তরে ঐ উপকার-প্রবৃত্তি
এমনতরভাবে বিনায়িত হ'য়ে
অনুবেদনী আগ্রহের সৃষ্টি ক'রতে পারে,–
যে-আগ্রহ
লোকের অন্তরে
অনুপ্রেরণা জুগিয়ে
তোমার প্রতি উপকার-প্রবণ হ'য়ে ওঠার
প্রলোভন জাগিয়ে তুলতে পারে;
তাই, সাধ্যানুপাতিক
লোক যা'তে তোমা হ'তে উপকৃত হয়–
তা' কর,

যা'কে ক'রছ–
সে তোমার জন্য যদি কিছু নাও করে,
ঐ প্রেরণা উপযুক্ত অন্তঃকরণে
এমনতর উন্মাদনার সৃষ্টি ক'রবে,
যা'তে সে তোমাকে দিয়েই কৃতার্থ হ'বে;
যদিও–
'অপাত্রে অযোগ্য দান
দাতা গ্রহীতা দুই-ই ম্লান',
আবার, পাওয়ার প্রলোভনে
উপকারী সাজলে
তা' কিন্তু ব্যর্থ হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী । ২৩৩ ।
শ্রেয়-সঞ্জাত, উৎকৃষ্ট-অনুধ্যায়ী
নারীই হো'ক আর পুরুষই হো'ক,
অপকৃষ্টকে যখনই তা'দের
সেবা ও পরিচর্য্যা করা প্রয়োজন,
সদাচার অন্বিত তৎপরতায়,
শ্রেয়-শালিন্যে,
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে,
অভিজাত গুরুগৌরবী পিতামাতার ন্যায়
হৃদ আবেগ নিয়ে
উপযুক্ত অনুশ্রয়ী আত্মনিয়মনে
তা'দের তা' করা উচিত,–
যে-পরিচর্য্যার ফলে,
ঐ অপকৃষ্টের অন্তরে
শ্রদ্ধোৎসারিণী সম্ভ্রমের উদ্দীপনা হ'য়ে ওঠে,
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব
পরিপোষণ করার ইচ্ছা
স্বভাবতঃই গজিয়ে ওঠে,
অনুসরণী অনুচলন
স্বতঃ হ'য়ে ওঠে তা'দের অন্তরে–
একটা ভক্তি-উৎসারিণী সমীহ নিয়ে
প্রাণ-স্পর্শী বিনীত অভিবাদন-অনুক্রমণায়;
এর ভিতর-দিয়েই
মাঙ্গলিক অভিসারণার
আবির্ভাব হ'তে থাকে;
নয়তো শ্রেয়হারা বিলোল সংস্রবের
সঙ্কীর্ণ আকর্ষণে
অযোন-জনন-প্রক্রিয়ার প্রভাবে
অর্থাৎ সংস্রবী সঙ্গতির ফলে
ঐ উৎকৃষ্ট যা'রা,
তা'দের অন্তঃকরণ সঙ্কীর্ণ সঙ্কুচিত হ'য়ে
ঐ অপকৃষ্টের প্রভাবান্বিত হ'য়ে ওঠে,
আর, তা' সহজেই হ'য়ে উঠতে দেখা যায়;
সেইজন্য সম্ভ্রমাত্মক ব্যবধান
সবারই পক্ষে মঙ্গলপ্রসূ,
বিশেষতঃ নারীর ত্বরিতই
সংস্রবদুষ্ট হ'য়ে থাকে–
পুরুষের চাইতে,
আর, তদনুগ আচরণেও
সংক্রামিত হ'য়ে ওঠে ত্বরিতই,
তাই, নারীদের পক্ষে
ঐ সম্ভ্রমাত্মক দূরত্ব বজায় রেখে চলা
অতীব প্রয়োজনীয়;
ঈশ্বর-অনুবেদনী আরতি
মানুষের উন্নতির পরমপ্রসাদ,
ঈশ্বরই পরম বিভু,
ঈশ্বরই জীবনের জীবন-বিভব । ২৩৪ ।

প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া

(শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত কথোপকথন)

সঙ্কলয়িতাঃ শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস; এম এ

(পূর্ব প্রকাশের পর)

কেষ্টদা– Born incorrigible (জন্মগতভাবে অসংশোধনীয় লোক) আছে কি? না, প্রত্যেককেই শোধরান যায়? এবং কী ভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর–The word 'impossible' is found in the dictionary of fools ('অসম্ভব' কথাটি বোকাদের অভিধানে পাওয়া যায়)। তেমন ক'রে পিছনে খাটতে পারলে–এক-একজনকে নিয়ে লেগে-প'ড়ে থাকতে পারলে প্রত্যেককেই বেশ কিছুটা শোধরান সম্ভব, কিন্তু তা' সব সময় কার্য্যত করা যায় না।

জন্মগত ভ্রষ্ট যারা
সৎ বা দয়ায় হয় না বশ,
ভয়েই কেবল অনুগত
শুভের পথে পায় না রস।

প্রথমে ভয় দেখিয়ে বাগে আনতে হয়, পরে ভালবাসা দিয়ে স্নিগ্ধ করতে হয়। তবে বরাবর সজাগ থাকতে হয়।

প্রফুল্ল– একটা খারাপ লোকের পাছে অফুরন্ত চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম ক'রে গভীর অধ্যবসায়ে সুদীর্ঘ দিনে তাকে ভাল ক'রে তোলা কি সমাজের পক্ষে লাভজনক? ওই চেষ্টাটা বহু ভাল লোকের পিছনে যদি দেওয়া যায়, তাহ'লে তো অনেক বেশি কাজ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর– একদল আলাদা লোক রাখা লাগে– যারা এই-সব লোককে শোধরাবার সহজ এবং সহজতর বিজ্ঞানসম্মত পন্থা আবিষ্কার সম্বন্ধে বাস্তবভাবে গবেষণা করবে। এমন একটা লোককে পরিবর্ত্তন করতে গিয়ে একজনের যে-শক্তি গজিয়ে উঠবে এবং সে যে অভিজ্ঞতা লাভ করবে, তাই-ই হয়তো জগতে শত-শত দূরারোগ্য মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত লোকের পরিবর্তনের সহজ পথ উন্মুক্ত ক'রে দেবে। তবে এ-কাজ সবার জন্য নয়। কিন্তু এদিকটা অবহেলাও করবার নয়। কারণ, সবাইকে নিয়েই সমাজ। সমাজদেহের যেখানেই ক্ষত থাক, সময়মত তার উপযুক্ত চিকিৎসা যদি না হয়, তবে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও তা' বিস্তারলাভ করবে।

কথা বলতে-বলতে বেলা হ'য়ে গেল। কখনও কেষ্টদা, কখনও যতীনদা, কখনও প্রফুল্ল দোভাষীর কাজ করছিলেন। অনুবাদের মাধ্যমে কথাগুলির পরিপূর্ণ রসটা ওঁরা (স্পেন্সরদা ও হাউসারম্যানদা) হৃদয়ঙ্গম করতে পারছিলেন না। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিটি অভিব্যক্তিই গভীর অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাচ্ছলে বললেন–আমি মূর্খ, কথা বলতে জানি না।

স্পেন্সরদা– কথা আপনি খুব ভাল বলতে পারেন। কথা বলার সময় আপনার সমস্ত সত্তাই সক্রিয় হ'য়ে ওঠে। তাই আপনার অভিব্যক্তি দেখে আমরা অনেকখানি অনুভব করতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)– তা'ছাড়া আমার উপায় কী? বোবারা দেখ না, মানুষকে মনের ভাব বোঝাতে কত চেষ্টা করে! (ঠারে-ঠোরে ভঙ্গী ক'রে দেখালেন)।

সকলে হো-হো ক'রে হাসতে লাগলেন।

২৮শে কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৩৫২ (ইং ১৩/১১/১৯৪৫)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার প্রাক্কালে নাট-মণ্ডপের ভিতর একখানি চেয়ারে এসে বসেছেন। একটু-একটু শীত পড়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের গায়ে একখানি আর্দ্দির চাদর। কালো চটিজুতা-জোড়া সামনে রেখে চেয়ারের উপর পা-দু'খানি গুটিয়ে বসেছেন। পাশে গাড়ু, গামছা, তামাক, সুপারি, টিকে, গড়গড়া, দাঁতখোটা ইত্যাদি। বেলা প'ড়ে এসেছে। অনেকে কাশীপুরের হাট সেরে জিনিসপত্র নিয়ে কেমিক্যালের মাঠের ভিতর-দিয়ে ত্বরিতপদে বাড়ী ফিরছে। শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহলদৃষ্টিতে সে-দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখছেন। চুপচাপ ব'সে আছেন। ধীরে-ধীরে দিনের আলো অলক্ষিতে করুণ ও ম্লান হ'য়ে উঠেছে। তপোবনের পাশে বাঁশবনে পাখীর দল সবিতৃ দেবকে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে শর্বরীসুন্দরীকে আবাহন করছে। খচ ক'রে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালার শব্দ হ'লো। কাশীদা (রায়চৌধুরী) লণ্ঠন ধরিয়ে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর

একবার আশেপাশে চেয়ে দেখলেন । কাছে ব'সে আছেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), রবিদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), পঞ্চাননদা (সরকার), প্যারীদা (নন্দী) । একটু দূরে থেকে টালার মা, তপোবনের শৈল মা, সুবোধের (বন্দ্যোপাধ্যায়) মা, মিনু মা ও তাঁর মা, সুরবালা মা, মঙ্গলদার মা প্রভৃতি প্রণাম ক'রে ফিরে যাচ্ছেন ।

পঞ্চননদা– স্বয়ম্ভূ মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর– যা' নিজে থেকে sprout করে (গজিয়ে উঠেছে) । অবশ্য তার ভিতর সেই সম্পদ থাকে যাতে গজিয়ে উঠতে পারে । Positive (ঋজী) থাকলে negative (রিচী) থাকে, এই দুইয়ের ভিতর আকর্ষণ, বিকর্ষণ, ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া চলে । তা'-থেকে আসে energy (শক্তি) । Condensed energy (ঘনীভূত শক্তি) হ'লো matter (বস্তু) । Energy (শক্তি)-হিসাবে যখন তা' থাকে, তখন তার কোন রূপ বা আকার থাকে না,তাই মনে হয় কিছুই নেই, ঐ নিরাকার energy (শক্তি) যখন আকার লাভ করে, তখন তাকে মনে হয় স্বয়ম্ভূ! কিন্তু কিছুই causeless (কারণহীন) নয় । স্থূলের পিছনে আছে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মের পিছনে আছে কারণ । কারণ আছে ব'লেই সূক্ষ্ম ও স্থূল আছে । কারণের মধ্যেই আছে কারণের sprouting agent (উদ্গময়ক শক্তি) । তাই তাকে বলা যায় স্বয়ম্ভূ ।

কেষ্টদা– একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বলেছেন, জগতের যা কিছু wave (তরঙ্গ)-এর different frequency (বিভিন্ন পৌনঃপুন্য) ছাড়া আর কিছু নয় । Matter (বস্তু) annihilated (বিনষ্ট) হ'য়ে যে প্রভূত energy (শক্তি) হয়, বর্ত্তমান বিজ্ঞানে তা' প্রমাণিত হয়েছে ।

শ্রীশ্রীঠাকুর– Energy (শক্তি), matter (বস্তু) ও life (জীবন) এই তিনের মধ্যেই সৎ, চিৎ ও আনন্দ অর্থাৎ অস্তিত্ব, সাড়া দেওয়া-নেওয়ার ক্ষমতা ও বৃদ্ধি পাওয়া-এই তিনটে factor (উপাদান) আছে ব'লে আমার মনে হয় । তবে degree (মাত্রা)-র তফাৎ । আমি এমনতরই বোধ করি । Converging energy (একমুখী শক্তি) matter-এ (বস্তুতে) evolve করে (বিবর্ত্তিত হয়) । Matter (বস্তু)-এর বিহিত converging combination (একমুখী সমাবেশ)-এর ফলে গজায় life (জীবন) । Life (জীবন) আবার superior tension-এ (উন্নত টানে) যত concentrated (একাগ্র) হ'য়ে ওঠে, ততই becoming (বৃদ্ধি)-এর দিকে এগিয়ে যায় । মানুষের মনটা হ'লো একটা bundle of complexes (প্রবৃত্তির পুটুলি) । মনকে অনুসরণ করতে গেলে সত্তা disintegrated (বিশ্লিষ্ট) হবার সম্ভাবনা থাকে । সেই জন্য চাই Ideal (আদর্শ) Libidoic adherence (সুরুতের টান) নিয়ে Ideal (আদর্শ)-কে অনুসরণ করতে হয় । তবেই জীবন গ'ড়ে ওঠে, বেড়ে ওঠে ।

কেষ্টদা-আপনি যা'অনুভব করেন তা' সত্য হ'লেও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহয্যে যত সময় তা' অন্যকে দেখিয়ে দেওয়া না যায়, তত সময় তা' বৈজ্ঞানিক সত্য ব'লে স্বীকৃত হবে না ।

শ্রীশ্রীঠাকুর–মানুষের মস্তিষ্ক-যন্ত্রে যা' ধরা পড়ে, তদনুরূপ সূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্কার ক'রে তা' দেখিয়ে দেওয়া অসম্ভব না । Perfection (পূর্ণতা) সম্বন্ধে কথা উঠলো ।

শ্রীশ্রীঠাকুর– Perfection (পূর্ণতা)-এর মধ্যে আছে thoroughly (পূর্ণভাবে) করা । আমরা যা-ই করি, তা' thoroughly (পূর্ণভাবে) করতে হবে । এই নিখুঁত করার ভিতর-দিয়ে perfection (পূর্ণতা)-মুখী habit (অভ্যাস) formed (গঠিত) হয় । Thorough (পূর্ণ) হ'তে গেলে thorough-তে (মাধ্যমে) যেতে হবে । যেখানে যে-বিধি সেই বিধি-অনুযায়ী করতে হবে । জীবনে যদি পূর্ণতা পেতে হয় তবে পূর্ণ কাউকে ধরতে হবে । He must be beyond jurisdiction of our complexes (তিনি হবেন আমাদের প্রবৃত্তি এলাকার উর্দ্ধে) । Complex (প্রবৃত্তি)-এর যে-কোন impulse (প্রেরণা)-ই আসুক না কেন, তাকে direct (পরিচালিত) করতে হবে তাঁর দিকে । তাঁর fulfilment (পরিপূরণ) ছাড়া নিজের fulilment (পরিপূরণ) ব'লে আলাদা কিছু থাকবে না । এইভাবে না চললে, complex (প্রবৃত্তি)-এর সঙ্গে identified (এলাকার) হ'য়ে থাকলে becoming (বৃদ্ধি) ব'লে কিছু হবে না । Becoming is always dependent on attacthment to Superior Beloved (বৃদ্ধি সব সময় প্রেষ্ঠের প্রতি টানের উপর নির্ভরশীল) । এর ভিতর-দিয়ে হয় meaningful adjustment of the universe (দুনিয়ার সার্থক নিয়ন্ত্রণ) । সাক্ষীস্বরূপ থেকে সব দেখা যায়, বোঝা যায়, উপভোগ করা যায় । হরেকরকমে life (জীবন)-টাকে enjoy (উপভোগ) করা যায় । প্রবৃত্তিগুলি যদি আমাদের কানে দড়ি দিয়ে লাখ নাচনে নাচায়, তখন

আর উপভোগ থাকেনা একটা মুহূর্তও যদি আমি আমাতে না থাকি, তাহলে উপভোগ করবে কে? একেই বলে পরাধীনতা। স্বাধীন আমরা তখনই হ'তে পরি যখন আমরা সর্বতোভাবে প্রেষ্ঠের অধীন হই। Being (সত্তা) জিনিসটাই dependently independent (পরাধীনভাবে স্বাধীন)। জন্ম নিতেই লাগে মা আর বাবা। বাবাও মা ছাড়া পারে না, মা-ও বাবা ছাড়া পারে না। তাই প্রেষ্ঠ ছাড়া perfection (পূর্ণতা)-এর ধাধা বাতুলতা। 'যতই মাকু ঘোরোফেরো চরকি ছাড়া নও।'

একটু থেমে হাসতে-হাসতে বললেন– দেখেন কেষ্টদা! বৈষ্ণবদের ঐ-যে কথা 'জীবন কৃষ্ণের নিত্য দাস' ও বড় জবর কথা! দাস মানে দান। Man is the gift of the eternal cohesive attraction (মানুষ চিরন্তন সংযোজনী সঙ্কর্ষণের দান)। Cohesive urge (সংযোজনী আকুতি) সবারই আছে সেই urge (আকুতি) নিয়ে যুক্ত হ'তে হবে–সর্বসত্তাকর্ষক কৃষ্ণ অর্থাৎ তাঁর মূর্ত্তবিগ্রহ গুরুর সঙ্গে। তবেই আমরা স্বস্থ থাকব, প্রকৃতিস্থ থাকব। নচেৎ আলাই-বালাই আর ছাড়বে না। আবার ঐ যোগনিরতি কা'র কতখানি অটুট তা' বোঝা যায় তা'র চলা, বলা, করা কতখানি thorough ও unblundering (নিখুত ও নির্ভুল)–তাই দেখে।

জন্মমৃত্যুরহস্য-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর– মৃত্যুর সময় মানুষ একটা ভাব বা চিন্তার ভিতর লয় পেয়ে যায়। ঐ ভাব বা চিন্তার ভিতর তার যা'-কিছু deeper impression ও inclination (গভীরতর ছাপ ও ঝোঁক) concentrated (একাগ্র) হ'য়ে থাকে। কোন দম্পতির মিলনকালে ঐ ভাবের সঙ্গতি যেখানে সৃষ্টি হয়, সেখানে তার আসা সম্ভব হয়। জন্মের পর প্রত্যেকের ভিতরই বিশেষ বিশেষ সংস্কার বা ঝোঁক দেখা যায়। সেগুলি জন্ম-জন্মান্তরে অর্জ্জিত বলা চলে। ঐ সংস্কারের সঙ্গে তার পিতৃপুরুষের সংস্কারের সাধারণতঃ যোগ থাকে। তাই সে সেখানে আসতে পারে।

পঞ্চাননদা– মৃত্যুর পর এবং পুনর্জ্জন্মের আগে এই অবস্থায় কি জীবত্মার কোন বোধ থাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর– থাকে।

কেষ্টদা– বোধ করতে গেলে তো চাই মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয়। তখন তো দেহই থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর– সূক্ষ্ম ভাবদেহ থাকে, আর তার মধ্যে সবই থাকে সূক্ষ্মভাবে। প্রত্যেকটা ভাবেরই রূপ আছে।

৩০শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৫২ (ইং ১৫/১১/১৯৪৫)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাতৃমন্দিরের পিছনদিকে বকুলগাছের তলায় বেঞ্চিতে ব'সে আছেন। ধীরেনদা (চক্রবর্ত্তী), যোগেনদা (বসু), ইন্দুধা (মিত্র), রমেশদা (চক্রবর্ত্তী), কুমুদদা (বল), মহিমদা (দে), বীরেনদা (মিত্র) প্রভৃতি এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত। নানাস্থানে নবান্নে কি-রকম সমারোহ হয় সেই সম্বন্ধে গল্প হ'চ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রশ্ন ক'রে ক'রে উৎসাহভরে শুনছেন। তাঁর সহজ, সুন্দর, আগ্রহদীপ্ত প্রিয়বচনে প্রীত হ'য়ে প্রত্যেকে প্রাণ খুলে ঐ আক্ষেপের সুরে বললেন– যত আমরা এই সব healthy custom ও tradition (কল্যাণকর প্রথা ও ঐতিহ্য) ভুলে up-to-date (আধুনিক) হচ্ছি, ততই আমাদের সর্বনাশ হ'চ্ছে। কথাপ্রসঙ্গে ধীরেনদা নানাস্থানে সেবা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানাদি গঠনে যুক্তি-যুক্ততা-সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর– কর্ম্মী না-বাড়িয়ে ওসব কাজে নিজেরা হাত দিতে যাওয়া ভাল নয়। ঐ ধরণের কাজ সুরু ক'রে যদি continuity (ক্রমাগতি) বজায় রাখতে না পার, তাতে হিতে বিপরীত হয়। উপযুক্ত যজমানদের দিয়ে বরং করাতে পার। নিজেই ঐ-কাজে হাত দিলে চোরাবালিতে আটকে পড়ার মত অবস্থা হয়। আদত কাজের scope (সুযোগ) পাওয়া যায় না। তুমি ঋত্বিক্, তোমার fundamental work (মূল কাজ) হ'লো to recruit initiates (মানুষকে দীক্ষিত করা), তাদের grow করান (বাড়িয়ে তোলা) তাদের ভেতর-থেকে nurture (পোষণ) দিয়ে worker (কর্ম্মী) বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে কাজ expand (বিস্তার) করা ভাল। ..... আর দেখ, মানুষের সঙ্গে খুব সাবধানে চলা লাগে। অনেক মানুষ inferiority- তে (হীনত্ববোধে) ভরা। Inferiority (হীনম্মন্যতা) যাদেরই আছে তাদের বলতে নেই 'অমুক কর' 'তমুক কর'। বরং বলতে হয়–এইরকম করলে কেমন হয়? এইভাবে বুঝে-বুঝে চলতে হয়।

ধীরেনদা– দুই একজন graduate (বিএ পাশ) part-time

assistant (আংশিক ব্রতী-সহকারী) পেলেও হ'তো ।

শ্রীশ্রীঠাকুর– সবই হয়, তুমি ঢিল দিলে কিছু হবে না । তেমনভাবে লাগলে চাকরী করা লাগে না । নিজেই লেগে পড়, তখন তুমিই পাঁচ জন whole-time graduate assistant (সর্বকালীন ব্রতী বি-এ পাশ সহকারী) পেয়ে যাবে এবং চালিয়েও নিতে পারবে তাদের । অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ, ধীমান, প্রিয়দর্শন সব কর্ম্মী জোগাড় করতে হয় ।

প্রফুল্ল– শোনা যায় যে, বাঙ্গালী ছাত্রেরা ভাল ক'রে শৃঙ্খলা মেনে চলতে জানে না । কিন্তু তারা সৈন্যবিভাগে যোগ দিয়ে সেখানে পট করে শৃঙ্খলা আয়ত্ত করলো কি-ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর–Trainer (শিক্ষক) disciplined (সুশৃঙ্খল), তাই সে জানে কেমন ক'রে discipline (শৃঙ্খলা) impart (সঞ্চারিত) করতে হয় । আবার ওখানকার পরিবেশও সাহায্য করে । অভ্যাস আয়ত্ত করার জন্য ধারাবাহিক একটা করার ক্রমের মধ্য-দিয়ে চলতে হয় । সেই করার ধারার মধ্যে ফেলতে পারলে nerve (স্নায়ু) দুরস্ত হয়, মনের থেকেও তখন ঝোঁক হয় । ভালবাসি ভালবাসি ব'লে rehearsal (মহড়া) দিয়ে ভালবাসলে যেমন করে, বলে, ভাবে–জোর ক'রেও তেমন-তেমন করতে থাকলে ভালবাসা গজিয়ে যায় । এই সম্ভাবনা আছে ব'লেই বলি–মানুষের ভরসা আছে সব সময়ই । Seek, ye will find and knock, it will open (সন্ধান কর, পাবে; টোকা, দাও, দরজা খুলবে) । লোকে যা' (যাহার পিছনে) যায় (ধাবিত হয়), তাই পায়-বিধি কা'রও বাম নয় ।

এমন সময় একটা বিড়াল গাছে উঠতে চেষ্টা করছিল । একজন নিজে ব'সে থেকে বললেন– বিড়ালটা তাড়িয়ে দে তো! সকলে যার-যার জায়গায় ব'সে একটু হু-হা করলেন, কেউ আর উঠলেন না । তখন শ্রীশ্রীঠাকুর প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে বললেন– তুমি যদি উঠতে, তাহ'লে আর কেউ হয়তো উঠে তাড়াতে যেত । যা' করাতে চাও মানুষকে দিয়ে, তা' করতে হয় নিজে– সাধ্য ও শক্তিমত ।

ধীরেনদা– মানুষের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কি-ভাবে বললে ভাল হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর– যার সঙ্গে যে-কথাই বল, তার মধ্যে একটা elating interestedness (উদ্দীপনী অন্তরাস) ও loving inquisiveness (ভালবাসাময় অনুসন্ধিৎসা) থাকাই লাগে । যে-ব্যবহার তোমার ভাল লাগে, অন্যের তা' সাধারণতঃ ভাল লাগার কথা–এটা স্মরণ রেখো ।

কাশীদা (রায়চৌধুরী)–দীর্ঘসূত্রতার অভ্যাস কাটান যায় কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর– আমাদের প্রবৃত্তি-আসক্তি ভাল কিছু করার পথে অনেক সময় একটা resistance (বাধা) সৃষ্টি করে । বলে–এখন থাক্, পরে করিস্ । ওতে সায় দিতে অভ্যস্ত হ'লে সর্বনাশ । সদিচ্ছা ও motor nerve (কর্ম্ম প্রবোধী স্নায়ু)–এর response (সাড়া) এই দুইয়ের মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্টি হ'য়ে যায় । আমি যে স্বস্ত্যয়নীর পাঁচটা নীতির কথা বলেছি, ব্রত-হিসাবে সঙ্কল্প নিয়ে ঐগুলি পালন করতে সুরু করলে অনেক দোষের মূলে যেয়ে হাত পড়ে, তাতে সংশোধনের সুবিধা হয় । মানুষের যত সদভ্যাসই থাক, তার একটা complex (প্রবৃত্তি) যদি ইষ্টার্থী হ'য়ে ওঠে, ঐ বদভ্যাস কাটাতে বেশী দেরী লাগে না । তাই গীতায় আছে–

অপি চেৎ সূদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সমগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥

লেখা আহ্বান

'সন্দীপনার' সুপ্রিয় পাঠক, লেখক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি সন্দীপনা'য় প্রকাশযোগ্য মানসম্মত সুন্দর লেখা পাঠানোর জন্য আহ্বান রইল । লেখা অবশ্যই পরিচ্ছন্ন হতে হবে । কম্পিউটার কম্পোজ কপি অধিকতর গ্রহণযোগ্য ।

-সম্পাদক

বাসনা ইচ্ছা মঙ্গল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের সমস্ত কর্মচেষ্টাকে উদ্‌বোধিত করে তোলবার ভার সর্ব-প্রথমে বাহিরের উপরে ন্যস্ত থাকে । সে আমাদের নানা দিক দিয়ে নানা প্রকারে সজাগ চঞ্চল করে তোলে ।

সে আমাদের জাগাবে, অভিভূত করবে না, এই ছিল কথা । জাগব এই-জন্যে যে নিজের চৈতন্যময় কর্তৃত্বকে অনুভব করব, দাসত্বের বোঝা বহন করব বলে নয় ।

রাজার ছেলেকে মাস্টারের হাতে দেওয়া হয়েছে । মাস্টার তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে, তার মূঢ়তা, জড়তা দূর ক'রে তাকে রাজত্বের পূর্ণ অধিকারের যোগ্য করে দেবে, এই ছিল তার সঙ্গে বোঝাপড়া । রাজা যে কারও দাস নয় এই শিক্ষাই হচ্ছে তার সকল শিক্ষার শেষ ।

কিন্তু, মাস্টার অনেক সময় তার ছাত্রকে এমনি নানা প্রকারে অভিভূত করে ফেলে. মাষ্টারের প্রতিই একান্ত নির্ভর করার মুগ্ধ সংস্কারে এমনি জড়িত করে যে, বড়ো হয়ে সে নামমাত্র সিংহাসনে বসে, সেই মাষ্টারই রাজার উপর রাজত্ব করতে থাকে ।

তেমনি বাহিরও যখন শিক্ষাদানের চেয়ে বেশি দূরে গিয়ে পৌঁছোয়, যখন সে আমাদের চেপে পড়বার জো করে, তখন তাকে একেবারে বরখাস্ত করে দিতে তার জাল কাটাবার পন্থাই হচ্ছে শ্রেয়ের পন্থা ।

বাহির যে শক্তি-দ্বারা আমাদের চেষ্টাকে বাইরের দিকে টেনে নিয়ে যায় তাকে আমরা বলি বাসনা । এই বাসনায় আমাদের বাইরের বিচিত্র বিষয়ের অনুগত করে । যখন যেটা সামনে এসে দাঁড়ায় তখন সেইটেই আমাদের মনকে কাড়ে–এমনি করে আমাদের মন নানার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে বেড়ায় । নানার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের এই হচ্ছে সহজ উপায় ।

এই বাসনা যদি ঠিক জায়গায় না থামে, এই বাসনার প্রবলতাই যদি জীবনের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে, তা হলে আমাদের জীবন তামসিক অবস্থাকে ছাড়াতে পারে না; আমরা নিজের কর্তৃত্বকে অনুভব ও সপ্রমাণ করতে পারি না । বাহিরই কর্তা হয়ে থাকে, কোনোপ্রকার ঐশ্বর্যলাভ আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয় । উপস্থিত অভাব, উপস্থিত আকর্ষণই আমাদের এক ক্ষুদ্রতা থেকে আর-এক ক্ষুদ্রতায় ঘুরিয়ে মারে । এমন অবস্থায় কোনো স্থায়ী জিনিসকে মানুষ গড়ে তুলতে পারে না ।

এই বাসনা কোন্ জায়গায় গিয়ে থামে? ইচ্ছায় । বাসনার লক্ষ্য যেমন বাইরের বিষয়ে, ইচ্ছার লক্ষ্য তেমনি ভিতরের অভিপ্রায়ে । উদ্দেশ্য জিনিসটা অন্তরের জিনিস । ইচ্ছা আমাদের বাসনাকে বাইরের পথে যেমন-তেমন করে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে দেয় না; সমস্ত চঞ্চল বাসনাকে সে একটা কোনো আন্তরিক উদ্দেশ্যের চার দিকে বেঁধে ফেলে ।

তখন কী হয়? না যে-সকল বাসনা না প্রভুর আহ্বানে বাইরে ফিরত, তারা এক প্রভুর শাসনে ভিতরে স্থির হয়ে বসে । অনেক থেকে একের দিকে আসে ।

টাকা করতে হবে এই উদ্দেশ্য যদি মনের ভিতরে রাখি তা হলে আমাদের বাসনাকে যেমন-তেমন করে ঘুরে বেড়াতে দিলে চলে না । অনেক লোভ সম্বরণ করতে হয়, অনেক আরামের আকর্ষণকে বিসর্জন দিতে হয়, কোনো বাহ্য বিষয় যাতে আমাদের বাসনাকে এই উদ্দেশ্যের আনুগত্য থেকে ভুলিয়ে না নিতে পারে সেজন্যে সর্বদাই সতর্ক থাকতে হয় । কিন্তু, বাসনাই যদি আমাদের ইচ্ছার চেয়ে প্রবল হয়, সে যদি উদ্দেশ্যকে না মানতে চায়, তা হলেই বাহিরের কর্তৃত্ব বড়ো হয়ে ভিতরের কর্তৃত্বকে খাটো করে দেয় এবং উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যায় । তখন মানুষের সৃষ্টিকার্য চলে না । বাসনা যখন তার ভিতরের কুল পরিত্যাগ করে তখন সে সমস্ত ছারখার করে দেয় ।

যেখানে ইচ্ছাশক্তি বলিষ্ঠ, কর্তৃত্ব যেখানে অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত, সেখানে তামসিকতার আকর্ষণ এড়িয়ে মানুষ রাজসিকতার উৎকর্ষ লাভ করে । সেইখানে বিদ্যায় ঐশ্বর্যে প্রতাপে মানুষ ক্রমশই বিস্তার প্রাপ্ত হয় ।

কিন্তু, বাসনার বিষয় যেমন বহির্জগতে বিচিত্র তেমনি ইচ্ছার বিষয়ও তো অন্তর্জগতে একটি আধটি নয় । কত অভিপ্রায় মনে জাগে তার ঠিক নেই । বিদ্যার অভিপ্রায়, ধনের অভিপ্রায়, খ্যাতির অভিপ্রায় প্রভৃতি সকলেই স্ব-স্ব প্রধান হয়ে উঠতে চায় । সেই ইচ্ছার অরাজক বিক্ষিপ্ততাও বাসনার বিক্ষিপ্ততার চেয়ে তো কম নয় ।

তা ছাড়া আর-একটা জিনিস দেখতে পাই। যখন বাসনার অনুগামী হয়ে বাহিরের সহস্র রাজাকে প্রভু করেছিলুম তখন যে বেতন মিলত তাতে তো পেট ভরত না। সেইজন্যেই মানুষ বারম্বার আক্ষেপ করে বলেছে, বাসনার চাকরি বড়ো দুঃখের চাকরি। এতে যে খাদ্য পাই তাতে ক্ষুধা কেবল বাড়িয়ে তোলে এবং সহস্রের টানে ঘুরিয়ে মেরে কোনো জায়গায় শান্তি পেতে দেয় না।

আবার ইচ্ছার অনুগত হয়ে ভিতরের এক-একটি অভিপ্রায়ের পশ্চাতে যখন ঘুরে বেড়াই তখনও তো অনেক সময়ে মেকি টাকায় বেতন মেলে। শ্রান্তি আসে, অবসাদ আসে, দ্বিধা আসে। কেবলই উত্তেজনার মদিরার প্রয়োজন হয়, শান্তিরও অভাব ঘটে। বাসনা যেমন বাহিরের ধান্দায় ঘোরায়, ইচ্ছা তেমনি ভিতরের ধান্দায়, ঘুরিয়ে মারে এবং শেষকালে মজুরি দেবার বেলায় ফাঁকি দিয়ে সারে।

এইজন্য, বাসনাগুলোকে ইচ্ছার শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ করা যেমন মানুষের ভিতরকার কামনা, সেরকম না করতে পারলে সে যেমন কোনো সফলতা দেখতে পায় তেমনি ইচ্ছাগুলিকেও কোনো-এক প্রভুর অনুগত করা তার মূলগত প্রার্থনার বিষয়। এ না হলে সে বাঁচে না। বাহিরের শত্রুকে জয় করবার জন্যে ভিতরের যে সৈন্যদল সে জড়ো করলে নায়কের অভাবে সেই দুর্দান্ত সৈন্যগুলোর হাতেই সে মারা পড়বার জো হয়। সৈন্যনায়ক রাজা দস্যুবিজিত রাজ্যের চেয়ে ভালো বটে, কিন্তু সেও সুখের রাজ্য নয়। তামসিকতায় প্রবৃত্তির প্রাধান্য, রাজসিকতায় শক্তির প্রাধান্য। এখানে সৈন্যের রাজত্ব।

কিন্তু, রাজার রাজত্ব চাই। সেই সরাজকতার পরম কল্যাণ কখন উপভোগ করি? যখন বিশ্ব-ইচ্ছার সঙ্গে নিজের সমস্ত ইচ্ছাকে সংগত করি।

সেই ইচ্ছাই জগতের এক ইচ্ছা, মঙ্গল-ইচ্ছা। সে কেবল আমার ইচ্ছা নয়, কেবল তোমার ইচ্ছা নয়, সে নিখিলের মূলগত নিত্যকালের ইচ্ছা। সেই সকলের প্রভু সেই এক প্রভুর মহারাজ্যে যখন আমার ইচ্ছার সৈন্যদলকে দাঁড় করাই তখনই তারা ঠিক জায়গায় দাঁড়ায়। তখন ত্যাগে ক্ষতি হয় না, ক্ষমায় বীর্যহানি হয় না, সেবায় দাসত্ব হয় না। তখন বিপদ ভয় দেখায় না, শাস্তি দণ্ড দিতে পারে না, মৃত্যু বিভীষিকা পরিহার করে। একদিন সকলে আমাকে পেয়েছিল, অবশেষে রাজাকে যখন পেলুম তখন আমি সকলকে পেলুম। যে বিশ্ব থেকে নিজের অন্তরের দুর্গে আত্মরক্ষার জন্যে প্রবেশ করেছিলুম সেই বিশ্বেই আবার নির্ভয়ে বাহির হলুম, রাজার ভৃত্যকে সেখানে সকলে সমাদর করে গ্রহণ করলো।

আহ্বান

ইষ্টপ্রাণেষু দাদা/ মা

রা-নন্দিত জয়গুরু। প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের অবারিত করুণায় পরমতীর্থধামে প্রতিদিনই বহু তীর্থযাত্রীর শুভাগমন ঘটে। এছাড়া আশ্রমে নিয়মিত ভক্তবৃন্দ এবং অবস্থানরত ছাত্রগণের দৈনন্দিন আনন্দবাজারের ব্যয় সংকুলানের ব্যাপারটি বেশ কঠিন হয়ে উঠেছে, সেক্ষেত্রে সারাদেশে অবস্থিত ইষ্টপ্রাণ সুযোগ্য ভক্তবৃন্দের অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে কিছু দায়িত্বগ্রহণ করতে পারেন। বছরের প্রতিদিনই অর্থাৎ ৩৬৫ দিনই জনপ্রতি ১দিন কেন্দ্রীয় আশ্রমে আনন্দবাজারের প্রসাদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংযোগ করলে আশ্রমের অর্থনৈতিক সাশ্রয় ঘটবে এবং দায়িত্ব গ্রহণকারীর প্রতিও পরমপিতার কল্যাণ অবারিত বর্ষিত হবে।

তাঁর এই করুণাধারায় মিলিত হবার জন্য সবার কাছে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

বিনয়াবনত–

সভাপতি
শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ

সাধারণ সম্পাদক
শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ

যুগপ্রেক্ষণায় অনুকূল-সাহিত্য

ড. প্রজ্ঞারঞ্জন দত্ত

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ।॥ ১
ওঁ গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ২
বেদ-বেদান্ত ব্যাকরণনানাশাস্ত্রার্থেবেদিনে
সীতানাথ নমস্তভ্যং শিষ্যকল্যাণকারিণে॥ ৩
শাস্ত্রাণ্যাধীত্যাপি ভবন্তি মূর্খাঃ ।
যস্ত ক্রিয়াবান্ পুরুষঃ স বিদ্বান্ ॥ ৪

সর্বপ্রথম আমার জীবনদেবতা শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রকে জানাই আমার অসংখ্য প্রণাম। ঠাকুর পরিবারের যে যেখানে আছেন প্রত্যেককে জানাই আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম। সভাপুরোহিত, ঋত্বিকদেবতারা, জ্ঞানীগুণী দাদারা এবং মায়েরা যারা শ্রীশ্রীঠাকুরকে কেন্দ্র করে এখানে সমবেত হয়েছেন প্রত্যেককে জানাই আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জয়গুরু এবং আন্তরিক রা। ছোটদের রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বিংশ শতাব্দীর এক পরম বিস্ময়। তিনি জ্বলন্ত জ্যোতিঃস্বরূপ। তাঁর পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হলেও তিনি ছিলেন, তিনি আছেন এবং অনন্তকাল তিনি আমাদের মধ্যে থাকবেন। তাঁর জীবন-দর্শনের যথোচিত মূল্যায়ন আজ পর্যন্ত হয় নি। ধর্ম, অধ্যাত্মবাদ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজনীতি, সুপ্রজনন প্রভৃতি বিষয়ে তিনি অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বের ছাপ রেখে গেছেন। তাঁর চিন্তাধারা যুগ যুগ ধরে মানুষের মনে প্রেরণা যোগাবে। তিনি যা' দিয়ে গেছেন তা শুধু বাংলার নয়, সমগ্র বিশ্বের অমূল্য সম্পদ।

জগদ্‌গুরু বা ব্রহ্মজ্ঞ লোকশিক্ষকদের ধরাধামে শুভাগমন ঘটে কোন ব্যক্তিবিশেষের জন্য নয়, আপামর জনসাধারণের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য। দেশ ও কালের সঙ্কীর্ণ সীমায় তাঁরা আবদ্ধ থাকেন না। তাঁরা সর্বযুগের–সর্বকালের। যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই লোকসংস্থিতির জন্য ভগবান তাঁর লীলা সহচরদের নিয়ে, যোগসংসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে ধরাধামে প্রকাশিত হোক। তিনি নিজে ধর্মাচরণ করে জনসাধারণকে কর্তব্যকর্মের নির্দেশ দেন। যুগপুরুষোত্তমগণের পার্থিব দেহাবসানের পর তাঁদের জীবনচর্যা ও বাণীই লোকশিক্ষার আকররূপে চিরসমাদৃত হয়। তাঁর নিম্নোদ্ধৃত বাণীটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ–

'প্রিয় পরম যা অন্ধকারে
বলেছেন
তা সর্ব্ব সমক্ষে বল
তিনি যা ফিস ফিস করে
বলেছেন
তা ঘরের মটকায়
দাঁড়িয়ে ঘোষণা, কোরো।
(-সুরত-সাকী ও শ্রীশ্রীঠাকুরের হস্তলিপি)

তাঁর একান্ত ইচ্ছা এবং বলেছেন,–

'এইসব ভাবধারা নিয়ে বইটই যত লেখা হয়, ততই ভাল। ভাল Literature (সাহিত্য) দিয়ে দেশ (flood) (প্লাবিত) করে দিতে হয়। সুবিধা হলে জেলায়-জেলায় প্রেস করতে হয়। –আলোচনা প্রসঙ্গে, ৫/২২২

কি করে মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ সম্ভব এই চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকতে তাঁকে দেখেছি এবং তারই প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর চলা-বলার, কথা-বার্তায়, অঙ্গ-সঞ্চালনে, তাঁর আত্মভোলা অপরূপ রূপে ও তাঁর বাণীতে এবং পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ তাঁর বাণীসমূহে। তাঁর দিব্যতনুর অপার্থিব মহিমার কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। এই অভাজনের প্রতি তার অপার্থিব করুণার কথা যতই ভাবি ততই বিস্মিত হই। তোকে ফিলসফিতে (দর্শন-শাস্ত্রে) এম এ পড়া লাগবে; প্রত্যুত্তরে বলি-আমার দ্বারা অসম্ভব। যুগপুরুষোত্তম বলেন,– 'তোর দ্বারা কি সম্ভব অসম্ভব তুই কি জানিস?- শিখবি– সংস্কৃতের মাষ্টার ডিগ্রীর জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা লাগে।' 'তুই সব জায়গায় যাবের পারবি না?" তোকে ডক্টরেট হওয়া লাগবে। দেওঘরে ১৯৬৬ সালের মাঝামাঝি ভয়াবহ দুর্ঘটনার সম্মুখীন হই; মাথা ফাটে, সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়। সুস্থ হবার পর প্রণাম করতে গেলে দয়াল বলেন, –

'পরমপিতার দয়ায় নূতন জীবন পাইছ, তাড়াতাড়ি ডক্টরেটটা সেরে ফেল ।' মহাপ্রয়াণের বেশ কিছুদিন আগেও বলেছিলেন, 'তোদের পরে বড় আশা; পরমপিতার নাম করে চলা লাগবে মনি'–ইত্যাদি কত কথা!

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সাহিত্য সম্ভার বিশেষ ভাবে অবহিত হওয়ার আগে তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে প্রণিধানের একান্ত প্রয়োজন বিশেষভাবে উপলব্ধ হয় । প্রেরিত পুরুষ গুরুরূপে অবতীর্ণ হয়ে ঈশ্বরের কথাই বলেন, মানুষের মন ঈশ্বর অভিমুখী করে তোলেন । এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, ঈশ্বর কোথায় আছেন? তিনি সর্বভূতের অন্তরে বিরাজমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা-ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদ্দেহের্জ্জুন তিষ্ঠতি (গীতা- ১৮/৬১) ।

ঈশ্বর শব্দের ধাতুগত অর্থ(ঈশ্বর=অধিপতি) ধা (ধারণ) ও পা (পালন) এর উপর দাঁড়িয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন– 'ঈশ্বর মানে ধারণপালনী সম্বেগ' অর্থাৎ ধরে রাখা ও পালন করার আকুতি যা সুপ্ত ও অবিন্যস্তভাবে প্রতিটি জীবের মধ্যে থাকে; দয়াল গুরু আমার মানুষের মধ্যকার সেই অন্তর্নিহিত আকুতিকে জাগ্রত করে তালেন ।

সাহিত্যের সম্যক অর্থ নির্ধারণে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বললেন,– মঙ্গলের সাথে যুক্ত যা তাকেই সাহিত্য বলে । [স(=সহ)+হিত (=মঙ্গল)=সহিত, সহিত+ষ্ণ্য (ভাবে)=সাহিত্য । হিত-প্রেরণায় উন্নত হয়/সাহিত্য সেই সার ।" শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের স্বহস্তলিখিত পুস্তক 'সত্যানুসরণ' নবযুগের নবগীতা । এই পুস্তকে সহজ সরল ভাষায় তিনি তার অভিমত অতি সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত করেছেন– 'অর্থ, মন, যশ ইত্যাদি পাওয়ার আশায় আমাকে ঠাকুর সাজিয়ে ভক্ত হ'য়ো না । সাবধান হও–ঠকবে; তোমার ঠাকুরত্ব না জাগলে কেহ তোমার কেন্দ্রও নয়, ঠাকুরও নয়-ফাঁকি দিলেই পেতে হবে তা ।'

অবিচ্ছেদ্য ইষ্টানুরাগ থাকলে বিরুদ্ধ যা কিছু তাকে অতি সহজেই আয়ত্তে এনে ফেলা সম্ভবপর হয় । প্রথম দিকে লোকশিক্ষার জন্য পার্ষদদের প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতেন (নাম) চলছে তো? অর্থাৎ নামের চাকা সব কাজের মধ্যে চলছে তো? নাম-নামী অভেদ । নামীর অনুশাসন ছাড়া নামের তাৎপর্য অনুধাবন করা যায় না । সেইজন্যই ত শ্রীশ্রীঠাকুর অনকূলচন্দ্র বললেন– 'নাম করতে করতে inter-cellular combusion (আন্তঃকৌষিক দহন) হয় । তা থেকে জ্যোতি, শব্দ ইত্যাদির অনুভূতি হয় । আবার কর্টেক্সের অনেক সূক্ষ্ম স্তর বিকশিত হতে থাকে । তা থেকে দৈববাণী ইত্যাদি শোনা যায় । অবশ্য ইষ্টের সঙ্গে যদি সঙ্গতি না থাকে, তবে তেমনতর দৈববাণীর উপর গুরুত্ব আরোপ করে সেই ভাবে চলা ঠিক নয় । –আলোচনা প্রসঙ্গে, ২১/৬৫

অন্যত্র তিনি বলেছেন, –'Literation মানে লিখতে পড়তে জানা, তার সঙ্গে চরিত্রের কোন সম্পর্ক নেই । Education (শিক্ষা) মানে–চরিত্রগঠন, habits, behaviour (অভ্যাস-ব্যবহার) ঠিক করা । নীতিগুলি জীবনের সঙ্গে গেঁথে ফেলা । –আলোচনা-প্রসঙ্গে, ৭/১৭১

ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা অনেক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সৎলোককেও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হতে হয় । অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে থাকার জন্য অনিচ্ছাকৃত ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে ভ্রান্ত চলনে চলে বিধ্বস্ত হতে হয় অনেককে । মানুষ যাতে অমনতর বিভ্রান্তিতে পড়ে দিশেহারার মত না ঘোরে, সেইজন্য পরমদরদী দয়াল আমার আমাদেরই কল্যাণের জন্য তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞানলব্ধ রত্নরাজি অখণ্ড সত্যদৃষ্টির আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন । যুগপুরুষোত্তমের প্রতিটি গ্রন্থই আজ লোকশিক্ষার আকর গ্রন্থরূপে সমাদৃত । তাঁর সাহিত্য-সম্ভার কল্যাণকামী রাষ্ট্র তথা পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ । এগুলো যুগযুগ ধরে মানুষের মনে প্রেরণা যোগাবে । এগুলোর মধ্যে কিছু আবার অতল সাগরের মত গভীর । সাধারণ লোকের পক্ষে তার সম্যক বোধায়ন খুবই কষ্টকর । তবে তার ছড়াগুলো এত সহজ, সরল ও ছন্দময় যা সব শ্রেণীর মানুষই অনুভব করতে পারে । ছড়াকারে, সংগ্রথিত গ্রন্থ 'অনুশ্রুতি' দিক দিশারীর কাজ করে । তার অনুপম ব্যক্তিত্বের কথা যতই ভাবি, ততই মোহিত হয়ে যাই । তিনি এখনও যেন বলছেন,– বেঁচে থাক আর বাঁচিয়ে রাখ–সুখে থাক আর সুখী কর; তার জীবনদর্শনের মূল কথা কিন্তু একই । তার শ্রীমুখ-নিঃসৃত বেদবাণী, তাঁর ছড়া ও তার উপদেশাবলী স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অমরার মন্দাকিনীধারার মত অবিশ্রান্তভাবে বিতরিত হত । তিনি কত কথাই না বলে উদ্বুদ্ধ করতেন আমাদের, কত কথোপকথন– কত্ত বিষয়ে বাংলা

ও ইংরেজীতে বাণী দিয়েছেন বিভিন্ন ধরনের সমস্যা নিয়ে তাঁর সম্যক পরিচয় প্রদান করা খুবই কষ্টকর । ব্যক্তিজীবনের কত দুর্যোগ, দাম্পত্য জীবনের ঘনঘটাচ্ছন্ন কত অবস্থা, সমাজ জীবনের সমস্যাবলী, পারিবারিক জীবনে বিভ্রান্তিগ্রস্ত, রাষ্ট্রজীবনে পথহারা ও পঞ্চকুণ্ডে নিমজ্জিত ব্যক্তিদের কত বিচিত্র ধরনের সমস্যা–তার অপূর্ব সন্ধান সমাধান
ও পথ পেল তার মনোমুগ্ধকারী আলাপে, মধুর আলোচনায় (যা পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়) ও বিচিত্র প্রেমময় ব্যবহারে কে তার হিসেব রাখে ।

প্রভু আমার সশরীরে না থাকলেও অতন্দ্র প্রহরীর মত সূক্ষ্মশরীরী হয়ে সর্বদা কাজ করে চলেছেন শয়নে স্বপনে, নিদ্রায়-জাগরণে অথচ আমরা স্থিতধী এবং স্থিতপ্রাজ্ঞ হতে পারছি না । এখনও যেন তিনি বলে চলেছেন,–

(১)

'আপ্তকামা হয়ে ধনি!
তুললি শুধুই প্রণয়রোল
ফ্যাসাদগুলি, কুড়িয়ে নিলি
সার হ'ল তোর ডামাডোল ।'– (সুরত সাকী/৩৫)

(২)

'প্রেয়চর্য্যা করতি যদি
ঐ আঙ্গুরের সরস নিয়ে
একটি চুমুক প্রিয়র তোমার
ফুটত চুমু হাজার হয়ে । –(সুরত সাকী । ৪২ ।)

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের প্রতিটি কথায় তাপিতপ্রাণ শীতল হয়, অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয়ে জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, নৈরাশ্যের মধ্যেও আশার আলো উদ্দীপ্ত হয় । মহাভাবাবস্থায় বিশ্বাসের মাধুর্য তিনি যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন তা ভাবগাম্ভীর্যে অতুলনীয় ।

(১)

'আমি একটা পাথরের ঢিবি হই, যদি বিশ্বাস করবি ভগবান বলে তবেই ভগবান' । (পুণ্যপুঁথি, ১৩/১৮)

(২)

'সবটার গোড়ায় বিশ্বাস । বিশ্বাস না থাকলে কারও কিছু হয় না । বিশ্বাস থাকলে সব হয়ে যাবে' । –(পুণ্যপুথি,১০/১৫)

(৩)

'দ্যাখ মহাশক্তি । যাকে ধরবি তারই শক্তি সঞ্চারিত হবে । মাজায় কাপড় বেধে লেপে যা! আমি আছি আমি থাকব । চরমে চরম প্রকাশ কল্কি । – (পূণ্যপুঁথি, ৪/২৮,২৯)
তিনি আরও বলেছেন,–
'তিনি তোমায় ধরেই আছেন
একাল-সেকাল সবকালে
তোমার ধরা হয় তখনই
ভক্তিতে প্রাণ দিলে ঢেলে ।' – (অনুশ্রুতি-২, আদর্শ-২৪)

সংস্কৃত ভাষাকে 'কামদুঘা' বলা হয়েছে অর্থাৎ ইচ্ছামত যে কোন শব্দ এ ভাষায় গঠন করা যেতে পারে । ধাতু ও প্রত্যয় যোগে অজস্র শব্দগঠন করার সুযোগ একমাত্র এই ভাষাতেই আছে এবং শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র যথোপযুক্তভাবে তার বাণী সাহিত্যে তা করেও দেখিয়েছেন । বিদেশী বহুশব্দ সংস্কৃতে আজ এমনভাবে স্থান পেয়েছে যেগুলোকে এখন আর বিদেশী বলে চিহ্নিত করা মুশকিল । ধাতু-প্রত্যয় সহযোগে তার উপযুক্ত ব্যুৎপত্তিও নির্নীত হয়েছে । একমাত্র সংস্কৃত ভাষা এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের দ্বারা ভাষাগত ঐক্য, রাষ্ট্রীয় সংহতি এবং ভাগবত চেতনার উদ্বোধন সম্ভব ।
আমাদের রামায়ণ-মহাভারত, বেদ উপনিষদাদি, চরক-সুশ্রুত, শুক্র-কামন্দক-মনু-যাজ্ঞবল্ক্য,কোটিলীয় অর্থশাস্ত্রাদি, বৈদিক গণিত, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক কিছুই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত । শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সাহিত্য সম্ভার বা বাণীসাহিত্য সম্যকভাবে বুঝতে গেলে সংস্কৃতভাষার বা দেবভাষার জ্ঞান আবশ্যক । তাই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বোঝার জন্য সংস্কৃত মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারও যে এ বিষয়ে অনেকটা এগিয়ে এসেছেন, তাতে আমি আন্তরিক-ভাবে সাধুবাদ জানাই ।
এক তালনবমী তিথিতে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসন্নবদনে শুভ্র শয্যায় সমাসীন । লোকজন আসছে, যাচ্ছে ও প্রণাম করছে । সবার মনেই স্ফূর্তি । অনেকের হাতেই নানারকম ভক্তি উপহার । কথোপকথনের মধ্যেই এক সময় সংস্কৃত ভাষায় তার স্বরূপ অভিব্যক্ত করে বলে উঠলেন–

'অনুকূলঃ সদা প্রভুঃ পদ্মনাভঃ মনোবিভুঃ ।'

অর্থাৎ, শ্রীঅনুকূলচন্দ্র শাশ্বত কালের জন্যই প্রভু তিনি পদ্মনাভ (বিষ্ণু) এবং সবার মনের একমাত্র বিভু বা অধিপতি ।

–প্রভু আমার অসংখ্য বাণী দিয়েছেন এই সংস্কৃত বা দেবভাষায় ।

শ্রীশ্রীঠাকুর বাণী পঞ্চক ভাবেও ভাষায় অতুলনীয়-

(১)

প্রিয়পরমকে অন্তরে প্রতিষ্ঠা কর–
ধৃতিচেতন তৎপরতায়,
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,–
পুণ্য-প্রতিষ্ঠা তোমার অন্তরে
স্বতঃ হয়ে উঠুক । – (ধৃতিবিধায়না, ২/৯২)

(২)

তোমার জীবনে মহাবীর জয়যুক্ত হউন
আর, সেই জয়শ্রীই হোক
শ্রীরামচন্দ্রর উপাসনা । –(ধৃতি-বিধায়না, ২/৯৩, পৃষ্ঠা- ৩৯ ।)

(৩)

কারও সাথে বিরোধ রেখে
যদি মন্দিরে যাও,–
দেবতার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠবে । -(ধৃতি-বিধায়না, ২/৯৮, পৃষ্ঠ-৪১) ।

(৪)

সৎ-এ সংযুক্তির সহিত
তদগতিসম্পন্ন যা'রা–
তা'রাই সৎসঙ্গী,
আর, তাদের মিলন ক্ষেত্রই হ'ল-
সৎসঙ্গ । -সংজ্ঞা- সমীক্ষা

(৫)

"যদি বিশ্বাস করিস তবে আর ভয় কি? ঐ বিশ্বাসটাই জানবি আমি । যা'র বিশ্বাস আছে তার আমি আছি । যে বিশ্বাস করে তাকে আমি সব দেই । যে বিশ্বাস করে, তার অপ্রাপ্য, আমার কাছে কি আছে? আমি সব দিব । –পূণ্যপুঁথি, ১৩/৩৬

যুগপুরুষোত্তমই হলেন অখণ্ড ঐক্য উদ্বোধনী জীবনদর্শনের জাগ্রত ও জীয়ন্ত প্রতীক। মিলনের মহামন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন যুগপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র । আসুন আজ এই মাহেন্দ্রক্ষণে তাঁরই বাণী সাহিত্যের অনুধ্যান করি এবং তারই নির্দেশিত পথে চলে সর্ববিধ সমস্যার সমাধানে তৎপর হই । প্রেরিত পুরুষেরা এক বার্তাবাহী, তাঁদের নির্দেশিত পথই অভ্রান্ত পথ এই পথ অনুসরণ করলে জীবনে পরম পুরুষার্থ অর্থাৎ ধারণ-পালন সম্বেগসিদ্ধ ব্যক্তিত্বলাভ বা ঈশ্বরপ্রাপ্তি সম্ভবপর হয় ।

সুখবর! **সুখবর!!** **সুখবর!!!**

আপনি কি নতুন লেখক? আপনার লেখা- গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও বিষয়ভিত্তিক সৃজনশীল লেখাগুলি প্রকাশ করতে আগ্রহী? তাহলে নিম্ন ঠিকানায় আজই যোগাযোগ করুন । আমরা শর্ত সাপেক্ষে আপনার লেখা ছাপার উপযোগী হলে অবশ্যই ছাপাবো ।

এছাড়া নভেল, নাটক, অনুবাদগ্রন্থ, সিরিজ গ্রন্থ, সাধারণ জ্ঞানের বই, কোরআন, হাদীস ও অন্যান্য সকল ধরণের বই পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ।

নিউজ কর্ণার পাবলিশিং
সিদ্দিকীয়া মিনি মার্কেট, আন্ডারগ্রাউন্ড
চাঁদনী বাজার, বগুড়া ।

ওস্যান ইন এ টি কাপ

(বিন্দুতে সিন্ধু)

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জীবনকাহিনী

রে, এ হাউজারম্যান (জুনিয়র) অনুবাদ-শ্রীমতি ছবি গোস্বামী

(পূর্ব প্রকাশের পর)

এক বছরের মধ্যেই দেওঘরে বিজ্ঞান কলেজের ক্লাসের কাজ শুরু হয়। এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পর। ঠাকুরের সামনে বসে আমি আর তালুকদার বেশ খোস গল্প করছিলাম। নানরকমের সব গল্প করতে করতে, প্রসঙ্গক্রমে আমি জানাই যে,–'আমেরিকান্ ফিল্ড সার্ভিস' ছাত্র বিনিময়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়াকে ক্রমশই বাড়াতে চেষ্টা করছে। আমার কথা শুনেই ঠাকুর সংস্কৃতের সেই স্মরণীয় উক্তিটি আবৃত্তি করলেন–"একসঙ্গে চলা, একসঙ্গে কথা বলা, এইভাবেই তো শান্তি'। এই বলেই তিনি তাকালেন তালুকদারের দিকে। তারপর তাকে বললেন,–"তালুকদার কি কয়?"

"আজ্ঞে"–বলে তালুকদার তাকালো। ঠাকুর তাকে সেই খোস মেজাজেই বললেন,–"তোমার সব ছাত্রের কি এই কাজের জন্য কিছু দিবের পারে না?" ঠাকুরের কথা শুনে আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম,–"ঠাকুর! আমি এই জন্য আপনাকে কথাটা বলিনি। আর, তাছাড়া আমাদের এখানকার ছাত্ররা, নিজেরাই তো কষ্ট করে চলে। সেখানে তাদের কাছ থেকে এরকম ব্যাপারে কোন কিছু আশা করা,---"

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে ঠাকুর বেশ জোরে তাঁর মাথাটা ঝাঁকিয়ে সামান্য বিষণ্নতা নিয়েই বলে উঠলেন আমার দিকে চেয়ে,–"হাউজারম্যান– হাউজারম্যান–তুমি কি এখনও বুঝবের পারো নাই যে, দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হয়েওটা চলে একসাথেই। এক্কেবারে নগদা-নগদি কাম হাতে হাতে। এটার মূল্য অনেক অনেক বেশী, কোন উপহার পাওয়ার চেয়ে। আর, আমরা আমাগরের ছাওয়াল-পাওয়ালগরেক্ এই কামেই লাগায়ে দিতে চাই। এই কাম করার কারণ একটাই, আমাগরের ছাত্রগরের ব্যাড়ে ওঠার সুযোগ দিবের চাই।"

A.F.S.-এর ডিরেক্টার মিঃ স্টিফেন গ্যালাট্টি, সৎসঙ্গের ছাত্র এবং শিক্ষকদের কাছ থেকে মোট দুশো পঞ্চাশ টাকার চেক পেয়ে, একটা চিঠি লিখে সৎসঙ্গকে জানিয়ে দিলেন,- "আমি কখনও এমন মর্মস্পর্শী উপহার পাইনি।"

(৩৪)

১৯৫৬ সালের মে মাস।

সৎসঙ্গে সমস্ত আনন্দোৎসব হঠাৎ করে যেন থেমে গেলো। সমস্ত ভারতব্যাপী সৎসঙ্গীদের হৃদয়স্পন্দন অত্যন্ত বেদনাদীর্ণ অনুভূতিতে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। শ্রীশ্রীঠাকুর পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে শরীরের ডানদিকটা অসাড় হয়ে গেছে।

বেশ কয়েক বছর ধরে তাঁর উচ্চ রক্তচাপ ছিলোই। সময় তিনি পেটের অসুখেও ভূগতেন। বিশেষ করে ভারতে 'এশিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা' আসার পর থেকেই।

দেখা গেছে যে, প্রত্যেকবার উৎসবের পর পরই তিনি বেশ শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়তেন। কিন্তু ঠাকুর এসব ব্যাপারকে অত্যন্ত সাধারণ তুচ্ছ ব্যাপার বলে মনে করতেন। আর, সব ভক্তরাও যেন তাদের আবেগমথিত স্বপ্ন বিভোর মনে ভাবতেন যে, ঠাকুর পার্থিব সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির উপরেই। কিন্তু পক্ষাঘাত তো এক অন্য ধরণের অসুখ। ফলে, ভক্ত অনুগামীরা সকলেই বেশ আতঙ্কিত হলেন। সকলেই বাস্তব অবস্থাকে অনুভব করলেন। বুঝলেন যে, তাদের ঠাকুর পৃথিবীর মরণশীলদেহে আবদ্ধ। আর, এই দেহটা আটষট্টি বছরের এক জাগতিক পার্থিব প্রকৃতিতে একজন বৃদ্ধ মানুষেরই। এই বয়সে এরকম অবস্থা যে অনেক সময় মৃত্যুরও কারণ হতে পারে–এটা এখন সকলেই ভালোভাবে অনুভব করলেন।

'বড়মা' আর 'বড়দা' সৎসঙ্গের বয়োজ্যেষ্ঠ শিষ্য অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে সংগঠন কাজে পরিচালনার ব্যাপার দেখাশোনার দায়িত্ব নিলেন। ঠাকুরের শরীরের কারণেই মূলতঃ প্রার্থনার শুরু আর শেষ সংক্ষিপ্ত করা হলো।

প্রায় দু' সপ্তাহ অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সঙ্গে তীব্র মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে কাটলো। সকলেরই একান্ত আন্তরিক প্রার্থনাতে, খুব ক্ষীণভাবে যেন আশার আলো উজ্জ্বলতর হতে শুরু করলো। কারণ, তিনি তাঁর হাতের শক্তি ক্রমশই ফিরে পেতে লাগলো। ব্যবহার করতে শুরু করলেন হাতটাকে। যা কিনা আগে একদমই অসম্ভব ছিলো।

ভক্তেরা খোলা বাঁশের ফ্রেম দিয়ে ঘিরে ভেতরে কাঠের দরজা

বসালেন । যাতে সকলে অন্ততঃ ঠাকুরকে দেখতে পায় । কিন্তু কথা না বলতে পারে আপাততঃ । তাই প্রায় আনুমানিক চল্লিশ গজ দূরে সেরকমের ব্যবস্থা করা হলো ।

সম্পূর্ণ গ্রীষ্মকাল, দিনের পর দিন ভক্তেরা শোভাযাত্রার মতোই দূর থেকেই ঠাকুরকে তাদের প্রাণের প্রণাম জানিয়েছেন । আশ্রমের শিশু, ছাত্রছাত্রী সকলেই হাতে করে ফুল নিয়ে দূরে থেকে দাঁড়িয়ে ঠাকুরকে দেখে প্রণাম জানিয়েছে । আর, ঘরের মধ্যে বসে, চারদিকের এমন ভক্তিপূর্ণ ভালোবাসার প্রণাম দেখতে দেখতে ঠাকুরের দু'চোখ জলে পূর্ণ হয়ে যেত । ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে ঠাকুর সুস্থ হয়ে উঠতে শুরু করতেই প্রতিদিন নির্দিষ্ট কিছু কিছু ভক্ত দর্শনার্থীদের ঠাকুরের কাছে আসার জন্য অনুমতি দেওয়া হতে লাগলো ।

এমন করে হঠাৎ যেন চাপিয়ে দেওয়া অবসরের মতো সময় ঠাকুরের জীবনে । আর এসময়ের মধ্যেই ঠাকুরের মায়ের সেই স্বপ্ন যেন আবার নতুন করে জেগে উঠলো । একটা আন্তর্জাতিক আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় । যা কিনা এতোদিনেও অচিন্তনীয় হয়েই থাকলো । প্রাচীন নালন্দার আদলে হবে । নাম হবে–"শাণ্ডিল্য বিশ্ববিদ্যালয়" ।

অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণে ঠাকুর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন । বিশ্ববিদ্যালয় যেন প্রায় পঞ্চাশটা স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রামের মতোই হবে । প্রত্যেকটিতেই অধ্যক্ষের ঘর, সাতজন করে ছাত্র থাকার মতো করে হবে । যাতে কিনা প্রত্যেক ছাত্রই তাদের অধ্যক্ষের সঙ্গে থেকে অন্তরঙ্গতার মধ্যে দিয়ে অস্তিবৃদ্ধির বৈশিষ্ট্যানুপাতিক ব্যবহারিক, তাত্ত্বিক আর প্রায়োগিক জ্ঞানার্জন করতে পারে । ঠাকুরের ধারণা অনুযায়ী যাকে বলা যেতে পারে–'গুরুকেন্দ্রিক শিক্ষা' । সেখানে বিজ্ঞান, কলা, ইত্যাদি সমস্ত শাখা যেমন থাকবে, তেমনি প্রত্যেকটি শাখার সঙ্গেই থাকবে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, তাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্য আর প্রয়োজন পরিপূরণের । যাতে সকলে সচেতনভাবেই মূল উদ্দেশ্যকে অনুভব সক্রিয়তায় অস্তিত্বের উন্নয়নে রক্ষা করে চলতে পারে ক্রমবৃদ্ধি তৎপরতাতে । সেই জন্যই তো ঠাকুরের সংজ্ঞা হলো,–'যেখানে বিভিন্নতা পৌঁছায় অর্থসহ ঐক্যের দিকে-তাই বিশ্ববিদ্যালয়' ।

নিজেদের আশা, বিশ্বাসের সীমানা থেকে বর্জন করা উচিত নয় । এই রকমের একটা বিশ্ববিদ্যলয়ের প্রতিষ্ঠার ধারণা মনমোহিনীদেবী অত্যন্ত সযত্নে উদ্ভাবন করে তার বাস্তবায়নের জন্য তখন সেই সময়ে ধার্য করা হয়েছিল, একশো কোটি টাকা । জায়গা আর পরিস্থিতি ও সময়ের পরিবর্তনে এখন হয়তো তার তিন চার গুণ প্রয়োজন হতে পারে । বর্তমানে এমন মহান প্রয়োজনের দাবী কোন্ এক অনাগত ভবিষ্যতের কুয়াসাচ্ছন্ন কোন এক তারিখের জন্য, এই সমস্ত পরিকল্পনা আর কর্মসূচী যেন অনেকটা আবর্জনার মতোই একপাশে পড়ে থাকলো ।

ঠাকুরের সুস্থতাতে ভক্তেরা অত্যন্ত আনন্দিত । এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে, সেই জ্যোতিষবচনের মতোই যেন চাঁদের সিঁড়ি বানানোর মতো ব্যাপারটা মনে হওয়াতেই সকলে বিনা প্রশ্নে আলোচনায় যেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ উদ্যম থেকে প্রায় হঠাৎ করেই থেকে গেলো ।

দেওঘরের উত্তর দিকে বিশাল অঞ্চল অব্যবহৃতভাবে পড়ে আছে । এই বিরাট আর একেবারে অকেজো জায়গায় বেশ ক্ষয়ে যাওয়া অনেক পাথরের টিলার মতো পরিপূর্ণতায় সাজানো অত্যন্ত মনোরম প্রাকৃতিক জায়গাটা । আর ঠাকুরের ইচ্ছামতো বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সেই প্রায় পঞ্চাশটা গ্রামের মতো পর্য্যাপ্ত জায়গাও আছে । দাম সেখানে যাই হোক না কেন, এ কাজের জন্য এই জয়গাটা অত্যন্ত সুবিধাজনক । ফলে, ঠাকুর তাঁর ইচ্ছা আর আগ্রহ প্রকাশ করলেন, এই জায়গাটাকে কেনার জন্য ।

চাষবাস জনবসতিহীন একটা পরিত্যক্ত অঞ্চলকে বাগানে উত্তরণের এমন বর্ণনা দিলেন, কি এক প্রাণবন্ত উজ্জ্বলতাতে, ঠাকুরের সেই উচ্ছলিত আবেগ যেন ভক্তদের সকলের ভিতরে সঞ্চারিত হলো । সকলে উদ্যমে উদ্দীপ্ত হয়ে নতুন জমি পরিষ্কারের কাজে আর ভবিষ্যতে সেখানে দালানের জন্য উপযুক্ত পাথর সংগ্রহ করে এক জায়গায় একত্রিত করার এক বিরাট রাজযজ্ঞ শুরু করে দিলো । প্রতিদিন এক একজন যে যতোটা পারে কাজ করতে লাগলো ।

সমস্ত কার্য্যক্রম থেকে নিয়মিত তহবিল গঠন করা হলো । যতোদিন না সেই জমি কিনে তার সত্ত্ব পাওয়া যায় ব্যবহারের জন্য, ততোদিন পর্য্যন্ত তহবিলে যা জমবে সেই মতোই ঐ নির্দিষ্ট জমিই পর্য্যায়ক্রমে কেনা হতে থাকবে আর তহবিলে অর্থও সংগৃহীত হতে থাকবে ।

কিছুদিন পর বাঁশের বেড়া তুলে দেওয়া হলো । ঠাকুর আবার স্বাধীনভাবে আগের মতো হাঁটাচলা করতে লাগলেন । তাঁর বিরাট পরিবারে তিনি তাঁর উপদেশ আর নির্দেশ, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় আবার আগের মতোই তত্ত্বাবধান করতে লাগলেন ।

তাঁর এমন অসুস্থতাতে তিনি শুধু একটা বিশেষ সুবিধা করে দিলেন যে, দিন আরম্ভ করা হতো একটু দেরীতে । আর দুপুরে একটু বেশী সময় তিনি ঘুমিয়ে নিতেন । অথচ, তাঁর বাণীলেখকগণ সকলেই জানিয়েছেন যে, তাঁর সংক্ষিপ্ত দিনেও

এক অফুরাণ কর্মপ্রবণতার চাঞ্চল্য ভরা থাকতো ঠাকুরের। কারণ, পাঁচজন বাণীলেখকই যেন সবসময়েই তাঁর বাণী আর নির্দেশ লেখার কাজ করে চলতেন অবিরাম গতিতেই।

১৯৫৮ সাল।

বসন্তকালে আমার মা সৎসঙ্গে ফিরে এলেন।

তিনি সোজাসুজি বললেন,–"আমার আর ঘরে ভালো লাগছে না। ভীষণ ক্লান্তি বোধ করছি। এখানে কতো অসুবিধার মধ্যেও দেখছি, প্রত্যেক জোড়া হাত কেমন প্রয়োজনীয় কাজ করে চলেছে। আর আমি সেখানে ঘরে বসে সময়ের অপব্যবহার করে চলেছি। আর সেইজন্যই আমি এসময় তোমাদের সাহায্যের জন্য এখানে চলে এসেছি। আমি ঠিক করেছি, অনির্দিষ্ট কালের জন্য এখানে থাকবো।

এড. স্পেন্সার আর আমি রোহিণী রোডে একটা বাড়ী ভাড়া নিয়েছিলাম। মা আসাতে, ঐ ছোট্ট ঘরসংসারের সব দায়িত্বভার মা নিজে নিয়ে নিতেই, বাড়ীর পরিবেশটাই যেন অনেক আনন্দের হয়ে উঠলো।

সৎসঙ্গীরা সকলেই মা'কে সাদরে আন্তরিক অভ্যর্থনাতে গ্রহণ করলেন। তাঁর সেবিকার অভিজ্ঞতা, বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা, প্রকৃতির সাথে মাঙ্গলিক আর নান্দনিক প্রীতিপূর্ণ কাজ,–সব কিছুই যেন একটা পারম্পর্য্য নিয়েই বেশ স্বাভাবিক সহজ ব্যস্ততাতেই পরিপূর্ণ রূপ দান করলেন।

পরের বছরে আমার মায়ের সব মহৎ আচরণ, আমার পক্ষে আর দেখা সম্ভব হয়নি। কারণ, শাণ্ডিল্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জমির জন্য অর্ঘ্য আহরণের কাজে আমি খুবই ব্যস্ত ছিলাম। সেজন্য আমাকে বেশীর ভাগ সময়েই বাইরে থাকতে হতো। সকলেই এই বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ, ভবিষ্যত উন্নয়ন,–এসব পরিকল্পনার কর্মসূচী জানানোতে ব্যস্ত থাকতাম। তবে, আমি যখনই আশ্রমে থেকেছি, মা'কে দেখেছি, ঠাকুরের নিজের জন্য, আশ্রমের অনেক কাজের জন্য, বেশ ব্যস্ততাতে–আনন্দে–খুশীতে ভরপুর হয়ে থাকতে। সেই কারণেই ঠাকুরের সত্তরতম আবির্ভাব দিনের উৎসবে আশ্রমে ফিরে আমি যখন জানলাম যে মা দেশে ফিরে যেতে চাচ্ছেন, তখন যেন সত্যি সত্যিই আমি খুবই অবাক হলাম।

মা আমাকে বললেন,– তিনি একদমই ভালো বোধ করছেন না। নানারকমের যন্ত্রণাতেই ক্লান্তি বোধ করছেন। আমি খুব জোরের সঙ্গে মাকে বললাম,–"এ বিষয়ে তুমি ঠাকুরকে জানাও। তিনি কি তোমাকে একটুও সময় দিতে পারছেন না?"

আমার কথা শুনে মা আমাকে বললেন,–"ইতিমধ্যেই ঠাকুরের নানারকমের ঝামেলা সামলাতে হয়েছিল। আর, আমি তো এখানে সাহায্য করতেই এসেছি। বোঝা হতে তো আসিনি।"

আমি মা'কে বললাম,–"স্বর্গ নিবন্ধন মা! তুমি এমনভাবে বলছো যেন তুমি খুবই অশক্ত! কিন্তু তুমি তো আদৌ তেমন না মা!"

মা কিন্তু মনস্থির করে ফেলেছেন। অনেকদিন হয়ে গেছে। মায়ের শরীরের সব কিছু আবার ভালো করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যই মা বাড়ী ফিরে যাবেন।

আমার কাছে যা মনে হয়েছে, হঠাৎ কর মায়ের এমন মনে হওয়ার পিছনে আছে একটা অহেতুক অতিশয় উদ্বিগ্নতা, আর আমার মায়ের বরাবরের স্বাধীন সার্বভৌম সিদ্ধান্ত।

ঐ রাতেই বলদেব সহায়ের সঙ্গে দেখা করে, কথা বলে আমার মনে হয়েছে যে, ঠাকুরের সঙ্গে তার জীবনের সম্মেলন সম্পর্ক, তা যে কোন ভাবে আর পদ্ধতিতেই হোক না কেন, –আমাকে যেন একটা প্রামাণিক এজাহার দিয়েছে।

আমি হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, ঠাকুরের দু'চোখ যেন এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে, প্রথমে একজন ভক্তের উপর, আবার পরক্ষণেই আর একজন, তারপর আরেকজনের উপর, এইভাবে সামনে একের পর এক যেন দৃষ্টি ঘুরে চলেছে। আমার কেন যেন মনে হলো, তিনি একা! সম্পূর্ণ একা! কিন্তু এটা কেমন করে হলো! ভালোবাসাময় এমন মানুষ তো আমি আমার জীবনে কখনও দেখিনি। আর, তিনিই তো সেই ভালোবাসার ব্যবহারিক আর প্রায়োগিক শিক্ষক। যা কিনা এক বিরল দৃষ্টান্তই।

আমি এক মুহূর্তের জন্য আমার চোখ বন্ধ করলাম। তারপর আবার তাঁকে লক্ষ্য করলাম। হ্যাঁ, তাই। সেই একই রকম অদ্ভুত দৃষ্টি। যার মধ্যে কোন চাতুর্য্যময় আলোর কৌশল নেই। ঠাকুরের দৃষ্টি যেন কোন এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়েই ক্রমাগত ছুটছে, দৌড়চ্ছে একের পর এক ভক্তজনের শরীর থেকে মুখের উপর দিয়ে। মনে হচ্ছে এক তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যেন ঠাকুর কোন এক একটা কিছু অন্বেষণ করছেন।

যখন আমি আমার মনকে স্থির করার চেষ্টা করছি, ঠিক তখনই দূরে বলদেব সহায়ের বক্তৃতার এক বিশেষ আরোহিত স্তরে সুরেলা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম,–"যদি আপনি ঠাকুরের দর্শন জানত চান, তবে তা সম্পূর্ণ আকারে এখানকার প্রকাশনালয়ে পাবেন। যদি আপনি অলৌকিক গল্প কাহিনী শুনতে চান, অথবা মনোবিজ্ঞানের বাঙ্ময় মূর্তির কোন প্রামাণ্য তথ্য জানতে চান, তাহলে এখানকার যে কোন মানুষকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন। তারা আপনাকে অনেক অদ্ভুত সব গল্প কাহিনী শোনাবেন। কেউ কেউ আবার অনেক অতিরঞ্জিত করতে পারেন। কেউ কেউ আবার বিস্তৃতি বিন্যাসে কার্য্যকারণের অভাবও ঘটাতে পারেন। কিন্তু তাদের

মধ্যে অনেক আছে, যারা একটা পাঠাগার পূর্ণ করতে পারেন, এবং বিভিন্ন উপায়ের পরীক্ষাতে তার বিশুদ্ধতাও পরীক্ষা করা যেতে পারে ।"

"সংরক্ষিত গৃহকোণে, কিংবা বিরাট বিশাল জনতার ভিড়ের মধ্যেও কিন্তু মানুষ আজ সত্যি সত্যিই খুবই ভীষণ একা! প্রত্যেকেই আজ যে ভালোবাসার ভিতরে আছে তা কিন্তু সম্পূর্ণ শর্তাধীন । সে সম্বন্ধে সকলেই আজ সচেতন । আর, এই সমস্ত অলিখিত শর্তকে যারা সঠিক ও সম্যকভাবে পূর্ণ করতে পারেনি, সেই সমস্ত পিতামাতা এবং বৃদ্ধ প্রপিতামাতাতেই পূর্ণ হয়ে আছে আজকের স্বাধীন দেশের জনসাধারণের সংস্থা সব বৃদ্ধাবাস!"

"কিন্তু এখানে আপনি যে-সমস্ত সাধারণ মানুষকে দেখতে পাচ্ছেন,– কুলি, কেরাণী, শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার–আর অন্যান্য সাধারণ সকলে, তারা কিন্তু সকলেই তাদের ঠাকুরকেই শুধু মাত্র এক পলকের জন্য দেখতে চান । কেবল মাত্র ভালোবাসার জন্য । যার মধ্যে কোন শর্ত নেই । কোন দাবী নেই । কোন আকাঙ্ক্ষা নেই । যা আছে, তা হলো শুধু মাত্র ভালোবাসা । তার সুস্থ অথবা অসুস্থ, অবজ্ঞাত বা অনুসৃত–তারা সকলেই জানেন যে, ঠাকুর তাদের দিকে কোনদিক কখনও পিছন ফিরবেন না । আপনারা কেউ কেউ হয়তো এসব দুর্বলতা বলে মনে করতে পারেন । কিন্তু, আমি আর আমার মতোই যারা জীবনে এমন এক একাকীত্বকে অনুভব করেছি বা করতে পেরেছি, হয়তো শুধু মাত্র তারাই এখানে এসেছি ।"

দূরের মঞ্চে, বলদেব সহায়ের বক্তৃতার সুরেলা স্বর ভেসে আসছে । আবার আমার মনোযোগ বলদেবের বক্তৃতার শব্দ স্বর থেকে ঘুরে গেলো । সামান্য মাত্র কুড়ি গজ দূরে থেকে আমি ঠাকুরকে দেখছি । আমি আবার তাঁর সেই একাকীত্বের অস্থিরতাকে অনুভব করলাম । তিনি যেন বারে বারে উদ্বিগ্নতার সাথে অনুসন্ধান করে চলেছেন, সামনে, দূরে চারদিকের চলমান মুখগুলো । আচ্ছা, এমন হঠাৎ করে কী এমন হতে পারে! যা কিনা ঠাকুর এমন এক নিবিড় নিমগ্নতায় নিরীক্ষণে অনুসন্ধান করে চলেছেন! আশার সমস্ত ভুবন ভরে এক জটিল বিস্ময়ের গ্রন্থিবদ্ধ অবস্থার ভাবে সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে আমি চুপ করে আমার ভিতরে, আমিই যেন বসে ছিলাম ।

বলদেব সহায়, বক্তৃতার মঞ্চ থেকে নেমে এসেছেন । সকলেই তাঁকে ঘিরে ধরে নানারকমের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে চলেছেন । তিনিও তাঁর অনুভব থেকেই সেসব কিছুর সঙ্গে মতবিনিময় করে চলেছেন । হঠাৎ করে মনে হলো যেন কোন একজনের কোন প্রশ্নে বলদেব জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইলেন তার কাছে,–"কি বললেন? একজন প্রেমিক মানুষ? হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি এমনই মনে করছি । কিন্তু কোন মানুষ, একজন মানুষকে যতোক্ষণ পর্য্যন্ত ভালো না বাসে, ততোক্ষণ পর্য্যন্ত তার হৃদয় বুঝতে পারে না । তার প্রেমিককে সে বুঝতে পারে না । ঠাকুর সকলকে ভালোবেসে গেলেন ।"

দৃষ্টি আকর্ষণ

সন্দীপনার চলার পথকে সাবলীল করার জন্য আপনার বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করুন । সেই সাথে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপন দিয়ে সন্দীপনার কলেবর বৃদ্ধিতে সহায়তা করুন ।

সৎসঙ্গ সংবাদ প্রেরণকারী/ লেখকবৃন্দের প্রতি সবিনয় অনুরোধ-পরিচ্ছন্ন কাগজের একপাশে স্পষ্টাক্ষরে লেখা হওয়া বাঞ্ছনীয় ।

-সম্পাদক

ফিরিয়ে আনতে হবে তপোবন শিক্ষা

স্বামী মৃগানন্দ

শাশ্বত সনাতন ভারতবর্ষ হিন্দুধর্মের দেশ। এখানে শিক্ষা সংস্কৃতি সভ্যতা ও জীবনদর্শন, সব কিছুরই মূল প্রেরণা মূল উৎস হিন্দুধর্ম। একথা সারা পৃথিবী জানে। আজ সর্ব বিষয়ে মুল্যবোধের চূড়ান্ত অবক্ষয়ের মধ্যেও বিশ্বের সব দেশই এখনও ভারতের দিকেই তাকায় জীবনের প্রকৃত তাৎপর্যের সন্ধানে। আমেরিকা প্রভৃতি ধনী দেশে জাগতিক সম্পদের সীমাহীন প্রাচুর্যেও মানুষ পাচ্ছে না প্রশান্তি এবং পরিতৃপ্তি। তারা খুঁজে পাচ্ছে না বাঁচার অর্থ ও উদ্দেশ্য। তারা অনেকেই ভারতে আসছে হিন্দুধর্মের স্বরূপ জানতে, হিন্দু জীবন-দর্শনের বাস্তব জ্ঞান। আহরণ করতে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তারা ইদানীং এদেশের যে ছবিটা দেখছে, তার সঙ্গে অনেক সময় মেলাতে পারছে না তাদের বিরাট আশা ও কল্পনার ছবিটাকে। বিবেকানন্দ বিশ্বের দরবারে ভারতের যে দিব্যোজ্জ্বল ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করে এসেছিলেন মাত্র একশ বছর আগে, তাকে যেন তারা খুঁজে পাচ্ছে না ভারতের মাটিতে।

তার কারণ, ভারতবর্ষের হিন্দুজীবন প্রণালী, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা, সবকিছুকে আজ হিন্দুরা নিজেরাই ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলছে। সংযম ও সৌন্দর্যের শৈল্পিক সুষমা মণ্ডিত শান্ত জীবন ধারাকে পরিত্যাগ করে হিন্দুরা নির্বিচারে অনুকরণ করছে পশ্চিমী সভ্যতার উদ্দাম অশান্ত চঞ্চল জীবন ধারাকে। কিন্তু তাতে যা দাঁড়াচ্ছে, তা হয়ে যাচ্ছে–'না ঘরকা না ঘাটকা' অথবা 'ইতো নষ্টঃ ততো ভ্রষ্টঃ' অবস্থা।

চতুর্দিকে সবাই বলছে দারুণ অবক্ষয়ের কথা। লোভ, দুর্নীতি, ক্রোধ, হিংসা, মিথ্যাচার, অনাচারের কালিতে চিত্রিত হচ্ছে সমাজচিত্র। দেশের তরুণ প্রজন্মই সমানে খুঁজে পাচ্ছে না উচ্চ আদর্শ, তো বহিরাগতদের কা কথা।

এই অবস্থার মূলে রয়েছে বস্তুনিষ্ঠ জীবনের আপাত চাক্‌চিক্যের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ও দেহসুখসর্বস্বতা। লক্ষ্যবস্তু কেবল টাকা, আর টাকা। 'আরও চাই' ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আকাশে বাতাসে। অর্থই মানযশ প্রতিপত্তির মানদণ্ড। সে অর্থ কেমন করে এলো, তাও গৌণ। যো সো করে বাড়াও ধনসম্পদ। স্বার্থসর্বস্ব বিবেকবর্জিত মানসিকতার ছড়াছড়ি। আদর্শের কথা, দেশের কথা, পরবর্তী প্রজন্মের কথা, এসব ভেবে সময় নষ্ট করার সময় কোথায়? ত্যাগ, সংযম, সততা, পরোপকার, এসব মূর্খতার নামান্তর বলেই গণ্য।

কিন্তু যত দূর যাক্ না কেন, এ পথ কখনই হিন্দুর পথ নয়। হিন্দুর জীবন একটি ধর্মাশ্রিত জীবনদর্শন। তাই হিন্দুর জীবন-প্রণালী কখনই ভোগসর্বস্ব নয়। ভোগ এবং ত্যাগের মধ্যে সমতা বিধানই হিন্দু ধর্মের নির্দেশ। জীবন শুধুমাত্র দেহসুখ ভোগের জন্য, এহেন দৃষ্টিভঙ্গী হিন্দুধর্মের কদাপি নেই। জৈবজীবনসর্বস্বতাকে এবং ধর্মহীন জীবন যাত্রাকে হিন্দুরা পশুত্ব তুল্যই মনে করে।

মানুষের জীবনে অর্থের প্রয়োজন আছে। জীবনধারণের জন্য নানাবিধ সামগ্রীরও প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু এসবের মধ্যে একটা সীমারেখা টানা দরকার। কারণ, প্রয়োজন এবং অঢেল সীমাহীন অর্থ-সম্পদই সব নয়। এই দেহও নশ্বর, জাগতিক ঐশ্বর্য ও নশ্বর। হিন্দুধর্ম সন্ধান দেয় আর একটি উচ্চতর উদ্দেশ্যের। সে উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্যকে জানা, ঈশ্বরকে পাওয়া, তাঁকে ভালবাসা এবং সৃষ্টির সবকিছুতে তাঁর প্রকাশকে উপলব্ধি করে 'সর্বযোগে' যুক্ত হওয়া। সেই সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ পরম-তত্ত্বকে যে নামই দিই না কেন, তিনি হচ্ছেন মানুষের চরম চাওয়ার বস্তু, পরম পাওয়ার বস্তু। এই সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য স্থিরভাবে নির্ধারিত হলে, স্থূল জীবনের গণ্ডী পেরিয়ে অনেক কিছু ভাবার এবং করার তাগিদ অনুভূত হয়।

হিন্দুধর্ম মানুষের ভেতরে এই ভাবকে সঞ্চারিত ক'রে তাকে উচ্চতর জীবনের উত্তরণে পথ বলে দিয়েছে। মানবসভ্যতার প্রভাত লগ্নেই হিন্দুঋষি-মুনিরা সে পথ দেখিয়েছেন সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে। সে পথ কিন্তু জীবনবিমুখ নয়। সে পথ খুবই সুচিন্তিত এবং বাস্তবের সঙ্গে যুক্ত, জীবন সম্পৃক্ত, জীবনের প্রকৃত অর্থবহ। সে পথ সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রসূত।

মানুষের জীবনকে হিন্দু ঋষিরা চারটি আশ্রমে বিন্যস্ত করেছেন। এই চতুরাশ্রম হচ্ছে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এই বিন্যাস যে কত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন তা একটু বিশ্লেষণ করলেই বুঝতে পারা যায়।

ব্রহ্মচর্য আশ্রমে তপোবনের পরিবেশে গুরুকুলের শিক্ষাপদ্ধতিতে ছাত্ররা শিক্ষালাভ করতো। শিক্ষকরা ছিলেন

গুরু বা আচার্য । তাঁরা ছিলেন ত্যাগী ও নির্লোভ । তাঁদের জীবনচর্যা তাঁদের আচার আচরণই ছিল ছাত্রদের শিক্ষার প্রথম ও প্রধান উৎস । তাঁদের জীবিকার যৎসামান্য প্রয়োজন শিষ্য ছাত্ররাই জুগিয়ে দিতো । আর্থিক অপ্রাচুর্য্য জনিত কষ্টকে তাঁরা কষ্ট বলে মনে করতেন না । সেটাকে বরণ করতেন তপস্যা বলে ।

ছাত্রদেরও শেখানো হ'ত ত্যাগ, তিতিক্ষা, সেবা ও নিরহংকারিতা । রাজার ছেলে আর গরীবের ছেলের মধ্যে ভেদ করা হ'ত না । সকলকেই আশ্রমের কাজে সমান ভাবে অংশ নিতে হ'ত, পরিশ্রম করতে হ'ত । জীবনচর্যা হ'য়ে যেত কঠোর তপস্যার ব্রত । নিজ নিজ পাঠ গ্রহণের সঙ্গে তারা শিখতো আদৌ শ্রদ্ধা– ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিনয় । তারই সঙ্গে তারা শিখতো পশুপাখির প্রতি শ্রদ্ধা, বৃক্ষলতা বনস্পতির প্রতি শ্রদ্ধা, প্রাকৃতিক এবং পরিবেশের সব কিছুর প্রতি শ্রদ্ধা । প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতায় প্রতিষ্ঠিত হ'ত তারা । আধার অনুযায়ী শিখতো বিভিন্ন রকম জাগতিক প্রয়োজনের বিদ্যা । তারা নিতো নানাবিধ শুভ সংস্কৃতির পাঠ । সংস্কৃতির চর্চা তাদের করতো সূক্ষ্ম মনোরাজ্যের অধিকারী । ভোগসর্বস্ব জীবনের চেয়ে বড় আকর্ষণের বস্তুর সন্ধান তারা পেত শিল্প সংস্কৃতির চর্চ্চায় । সর্বোপরি শিখতো আধ্যাত্মবিদ্যা, পরা বিদ্যা । জীবিকা অর্জন ও সৎচরিত্রগঠন, উভয় উদ্দেশ্যই সমভাবে পূর্ণ হ'ত গুরুকুলের শিক্ষাপদ্ধতিতে ।

তপোবনের ব্রহ্মচর্য আশ্রমে পূর্ণরূপে সংস্কারিত হয়ে যেতো ছাত্রদের জীবন । তারা ভালভাবেই উপলব্ধি করতো একটি পূর্ণাঙ্গ মনুষ্য জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য । বুঝতো ব্যক্তিজীবনের সার্থকতা কিসে এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে তার ভূমিকা কি । ব্যক্তিই তো সমষ্টির একক ।

এর পর একজন শ্রদ্ধাবান সুনাগরিকের ভূমিকা পালন করতে সেই সুসংস্কৃত ব্যক্তি প্রবেশ করতো গার্হস্থ্য আশ্রমে । সেখানে তার সাধ্য সামর্থ্য ও গুণানুযায়ী করতো ধনসম্পদ ঐশ্বর্য আহরণ । ভোগসুখ, পরিবার প্রতিপালন, নানাবিধ সাংসারিক কর্তব্য সম্পাদন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেত গার্হস্থ্য জীবন । অভ্যুদয়ের পূর্ণতায় সার্থক হ'ত জীবনের এই পরিচ্ছেদ ।

তারপর ছিল বানপ্রস্থের বিধান । বলা হ'ত 'পঞ্চাশোর্ধেস্ব বনং ব্রজেৎ' । রিটায়ারমেন্ট বা অবসর গ্রহণ তখনকার সেই মানুষের কাছে বিষাদের বা শূন্যতার বিষয় ছিল না । রিটায়ারমেন্টকে দূরে ঠেলারও তার আগ্রহ ছিল না । সে মানসিক স্তরে প্রস্তুত থাকতো অবসর গ্রহণের মাধ্যমে বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশের জন্য । সাংসারিক দায় দায়িত্ব মায়ামোহ ইত্যাদি থেকে ক্রমশঃ মুক্ত হয়ে সে এগিয়ে যেতো আত্মিক উন্নতির মার্গে । তারই সঙ্গে করতো সমাজের ও দেশের স্বেচ্ছা সেবা । তার অর্জিত অভিজ্ঞতা ও অবশিষ্ট কর্মশক্তির ব্যয় হ'ত 'আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্বিতায় চ' । নিজ আত্মার কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে বহুজনের হিতসাধনে সে নিরত থাকতো ।

তারপর বৈরাগ্যের পূর্ণতর অবস্থায় অথবা ঈশ্বর লাভের নিমিত্ত তীব্র ব্যাকুলতার অবস্থায় সে গ্রহণ করতো সন্ন্যাসের মার্গ । সেখানে সে প্রবেশ করতো আরও গভীর অধ্যাত্ম রাজ্যে । মোক্ষ, কৈবল্য, কিংবা ইষ্টলাভের চরম লক্ষ্যে তার দৃষ্টি হয়ে যেত স্থির নিবদ্ধ । তখন একটা অবস্থালাভের পর গুরুইষ্টের প্রেরণায় সে আবার বিতরণ করতো অধ্যাত্ম জ্ঞান । আর নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে পূর্ণ করতো জগৎকল্যাণের ব্রত ।

এই চতুরাশ্রমের সুরু কিন্তু বাল্যকালের সেই ব্রহ্মচর্য আশ্রমের শিক্ষার মধ্য দিয়ে । জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সেখানেই স্থির হয়ে যেতো বলেই তার পক্ষে সম্ভব হ'ত ভোগ এবং যোগের সমন্বয় করা ।

হিন্দুধর্ম চারটি পুরুষার্থ অর্জনের কথা বলে । সেগুলি হচ্ছে ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ । এই চার পুরুষার্থের প্রথমটি হচ্ছে ধর্ম । এই ধর্মই জীবনের বাকী সব কিছুর ভিত্তিস্বরুপ । তাই ব্রহ্মচর্য আশ্রমের শিক্ষার মূল কেন্দ্রই ধর্ম । ধর্মের ভিত্তি যত দৃঢ় হবে জীবনের উৎকর্ষ হবে ততই সুন্দর, ততই মহান ।

আজ এসব কথা হয়তো একটু কল্পনাপ্রবণ রূপকথার মতই শোনাবে । হ্যাঁ, তা একটু শোনাতে পারে । কারণ, আধুনিক কান তো এসব কথা শুনতে অভ্যস্ত নয়, আধুনিক প্রাণ তো এসব কথার মর্মবোধে অভ্যস্ত নয় । আজ আমরা নিজেদের গৌরবময় মহিমাময় শিক্ষাসংস্কৃতি, শিল্পচর্চা ইত্যাদিকে অবজ্ঞা করতে শিখেছি । এসবের মূলে যে ধর্ম, সেই ধর্মকে বর্জন করতে শিখেছি । চাপানো বিদেশী শিক্ষাপদ্ধতির পরিণাম হচ্ছে নিজের সবকিছুকে কুসংস্কার বলে জানা, খারাপ বলে জানা । এই ধর্মবর্জিত বা ধর্মনিরপেক্ষ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার দান হচ্ছে– আত্মবিশ্বাসহীন, আত্মমর্যাদাবোধহীন, চিন্তাস্বাতন্ত্র্যহীন, ডিগ্রীধারী কেরিয়ারসর্বস্ব মানুষ ।

বর্তমান কালের এই সেক্যুলার শিক্ষাপদ্ধতির বলিস্বরূপ কিশোর তরুণের দল জানতেই পারছে না কি তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য, কি তারা হারাচ্ছে। তাদের মর্যাদা, তাদের স্বাভিমান, তাদের গৌরব কিসে, তারা বুঝতেই পারছে না। কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ, তা তুলনা করার মত প্রাথমিক জ্ঞানের খোরাক থেকেও তারা হচ্ছে বঞ্চিত। কারণ, নিজের গৌরবময় ঐতিহ্যকে পূর্ণশ্রদ্ধার সঙ্গে না জেনে, আগে ভাগেই তারা হয়ে যাচ্ছে বিদেশী শিক্ষাপদ্ধতি প্রদত্ত সংস্কার রাশির দ্বারা আচ্ছন্ন।

আজ ধর্মকে এড়িয়ে চলার ভাবটাই সমাজে বিশেষ ভাবে সংক্রামিত হচ্ছে। শুধু তরুণরা নয় বয়স্করাও সেই একই ভাবের ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছেন। সমাজে এক এক সময় এক একটা হওয়া আসে। এ হাওয়া পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির হাওয়া। এখন পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি নামে যা হরদম পরিবেশিত হচ্ছে, তা হচ্ছে উদ্দাম চঞ্চলতার বহির্মুখিনতার ও নিম্নগামিতার প্রতীক। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে স্বদেশী ভাব এবং ভাষা উভয়েরই লাঞ্ছনার চরম চলছে। আজকের সিনেমা জগৎ এ বিষয়ে পথিকৃৎ। প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রের মধ্যে আমরা পাই নয়টি রসের কথা। যেমন, শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভূত এবং শান্ত। এখন টি. ভি. ইত্যাদির মাধ্যমে যা পরিবেশিত হচ্ছে তাতে একটা রসই হয়ে উঠেছে প্রধান– সেটা বীভৎস রস।

গেল গেল বলে শুধু সমালোচনা, আক্ষেপ এবং নিন্দা প্রতিবাদ করে বিশেষ কিছু লাভ নেই। অযথা কিছুটা সময় নষ্ট হয়, শক্তি ক্ষয় হয় মাত্র। এখন প্রয়োজন সেই প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মচর্য আশ্রমের তপোবন শিক্ষাকে যেমন ক'রে হোক্ ফিরিয়ে আনা। এর জন্য প্রয়োজন কিছু গভীর উদার চিন্তাপ্রসূত পরিকল্পনা। প্রাচীনের অপরিহার্য ভাল জিনিষকে ফিরিয়ে আনতে হবে আধুনিক যুগের পটভূমিতে। কাজটা দুরূহ নিশ্চয়ই। কিন্তু প্রয়োজনই আবিষ্কারের জননী। প্রয়োজনটা উপলব্ধি করতে হবে প্রথমে। বুঝতে হবে প্রতিটি ব্যক্তি সুনাগরিক রূপে তৈরী না হ'লে ভারতবর্ষের স্বকীয় ধর্মসংস্কৃতি, দর্শন, বিজ্ঞান, জীবন পদ্ধতি কোনওটাই বাঁচবে না। তাই গড়তেই হবে ধর্মপ্রাণ নতুন প্রজন্ম যারা এই স্বদেশী সম্পদের সত্যিকার ধারক বাহক হবে। পথ বেরিয়ে আসবে ঠিকই।

কেউ কেউ বলে থাকেন যে, সংস্কৃত সংস্কৃতি ও ধর্ম ভিত্তিক তপোবন শিক্ষা পুনঃ প্রবর্তিত হলে আমরা গরুর গাড়ীর যুগে ফিরে যাবো এবং ভারতবর্ষ হাজার বছর পিছিয়ে যাবে। আমরা বলি সেটা যদি হয় তো মঙ্গলই হবে। ভেবে দেখুন হাজার হাজার বছর আগের ভারতবর্ষের কথা। সে যুগ মোটেই গরুরগাড়ীর যুগ নয়। সে যুগে আমরাই আবিষ্কার করেছি পুষ্পক বিমান, মেঘের আড়াল থেকে অদৃশ্য হয়ে যুদ্ধ করা যায় এমন সব বিমান, আবিষ্কার করেছি দূর পাল্লার অর্ণবপোত। বাস্তুবিদ্যা, চিকিৎসা বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছি জ্ঞানের চরম সীমা। আবিষ্কৃত হয়েছে লেজারবীম সার্জারির চেয়েও সূক্ষ্ম শল্যচিকিৎসার বিজ্ঞান।

প্রাচীন ভারতের ঋষিরাই দিয়েছেন পূর্ণাঙ্গ আয়ুর্বেদ। প্রয়োজনীয় সকল বেদ বা জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার সমৃদ্ধ সেই প্রাচীন উচ্চতা থেকে সরে আসা নবীনরা বলছেন– আমরা নাকি উন্নয়নশীল দেশ এবং আরও উন্নতি ও প্রগতির জন্য আমাদের হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করতে হবে বিদেশীদের কাছে। এটা মতিভ্রম, না ক্রীতদাস সুলভ মনোভাব, না দুইই, কে জানে?

শ্রীঠাকুর সত্যানন্দ বলেছেন–'বৈদিক যুগে ধর্মকে আদর্শ করে আমাদের এই অমর ভারত গ'ড়ে উঠেছে। যার ফলে বহু মহামানবের সৃষ্টি হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। ধর্ম ও নৈতিকতাই শিক্ষাদানের মূল ভিত্তি হওয়া উচিত। তাই বৈদিক যুগের ধর্মভিত্তিক তপোবন শিক্ষাকে যতটা সম্ভব ফিরিয়ে আনার দরকার।'

আজ প্রয়োজন গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে স্বাভিমান নিয়ে উঠে দাঁড়ানো। যেখানে উন্নতির ধারা ব্যাহত হয়ে থেমে গিয়েছিল, যেখানে ঋষিদের রিসার্চের ধারা ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল নানা ঘাতপ্রতিঘাতে সেখান থেকে আবার আমাদের সুরু করতে হবে সবকিছু। প্রাচীনের সঙ্গে নূতন যুগকে মেলাতে হবে একটি নূতন সেতুর বন্ধনে।

শ্রীঠাকুরের কৃপাশক্তি আমাদের সম্বল্ তাই অটুট মনোবল এবং আকুল প্রার্থনা সহ আমাদের এগিয়ে যেতে হবে আদর্শকে নামিয়ে আনতে বাস্তবে। আর সেই আদর্শকে ছড়িয়ে দিতে হবে সকলের মধ্যে সর্বস্তরে। দিব্য জীবনের আলো পৌঁছে দিতে হবে অন্ধকারে আবদ্ধ কোটি কোটি দীন দরিদ্র অবহেলিত মানুষের কাছে। মানুষকেই দেবতা হ'য়ে দাঁড়াতে হবে মানুষের পাশে। শ্রীঠাকুর আমাদের সামর্থ্য দিন সাফল্য দিন–এই প্রার্থনা।

মানসতীর্থ পরিক্রমা

সুশীলচন্দ্র বসু

কীর্ত্তনের মাঝখানে শ্রীশ্রীঠাকুর দু'বাহু তুলে মোহনভঙ্গীতে প্রাণের উচ্ছল প্রাচুর্য্যে নৃত্যরত, তাঁর বদনমণ্ডল অপূর্ব্ব জ্যোতিবিভায় মণ্ডিত । সে অপূর্ব্ব সুঠাম মনোহর নৃত্যভঙ্গী যে না দেখেছে তাকে ভাষায় বুঝানো কঠিন । সে কীর্ত্তনের এমনি মোহনীয় আকর্ষণীয় শক্তি যে শত-শত লোক সে-আকর্ষণে আকৃষ্ট হ'য়ে কীর্ত্তনে যোগ দিল । যে-আমি কোনদিনই কীর্ত্তনে যোগ দেইনি, সেই আমিও স্থির থাকতে পারলাম না । দু'বাহু তুলে কীর্ত্তনে ঝাঁপিয়ে পড়লাম ।

কীর্ত্তনে এমনি আলোড়ন সৃষ্টি হ'ল যে– দেখলাম তিন-চারটে কুকুর সে-কীর্ত্তনে 'যোগ দিয়ে নাচছে, মানুষ তো কোন্ ছার ! দূরে গাভীরা 'হাম্বা' 'হাম্বা' রব করতে লাগলো । এমন অপূর্ব্ব কীর্ত্তন আমি পূর্ব্বে কখনও দেখিনি বা আমার কল্পনাতেও ছিল না । শুনেছি, মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কীর্ত্তনে এরূপ মতোয়ারা হ'তেন । মনে হ'ল-সে কীর্ত্তন এ ধরণেরই হয়তো হ'বে ।

কীর্ত্তনে নাচতে নাচতে সহসা শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহখানি বাহ্যজ্ঞানশূণ্য ও বিবশ হ'য়ে মাটিতে এলিয়ে পড়ল । মনে হল–তাঁর দিব্য দেহখানি বাহ্যচৈতন্যহীন হ'য়ে শবের মতন পড়ে আছে । শরীরে যে চৈতন্য আছে তা' তখন বুঝতে পারলাম যখন দেখলাম-তাঁর ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটি থর থর করে কাঁপছে । আমি তো হতচকিতই হ'য়ে গিয়েছিলাম । মনে হল'–কীর্ত্তনের মাঝে এ কী ব্যাপার ঘটল । পার্শ্ববর্ত্তী একজন আমাকে তদবস্থ দেখে আমার দৃষ্টি তাঁর ডানপায়ের বুড়ো আঙ্গুলের দিকে নির্দ্দেশ ক'রে দেখালেন । এরূপ অবস্থা হ'লে কেউ তাঁর শরীর স্পর্শ করত না, করলে নাকি তাঁর খুব কষ্ট হ'ত ।

আমি এগিয়ে এসে তাঁর মাথার কাছে বসলাম । দেখলাম, চক্ষু পলকহীন, চক্ষুতারকা স্থির অচঞ্চল, কপালটা যেন চক্‌চক্ করছে । কৌতুহলী হ'য়ে তাঁর গায়ে হাত দিলাম, কেউ আমাকে বারণ করল না । গায়ে হাত দিয়ে দেখি-শরীরটা হিমশীতল । কীর্ত্তনের পর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দ্রুততর হওয়াই স্বাভাবিক । কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার কোন লক্ষণই অনুভব করতে পারলাম না । বিস্ময়াবিষ্টের মত তাঁর দেহের দিকে তাকিয়ে রইলাম ।

এমতাবস্থায় হঠাৎ বিদ্যুৎ-ঝঙ্কারের মত তাঁর কন্ঠে উদ্‌ঘোষিত হ'য়ে উঠল উদাত্ত বাণী–"রাখো, ওগো রাখো– কেবল রক্ত, রক্তগঙ্গা ছুটে গেল, এখনও নীরব, নিস্পন্দ? এখনও ঘাতকের মত ভুলে আছিস? প্রেমের সন্তান তোরা! ঐ দেশের মাটিতে, বুকে ধ'রে হৃৎপিণ্ড ধ'রে কে প্রেম দিয়ে গেছে রে? ও রে, সে যে আমারই .....নির্দয়রূপে চোরের মত ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিল! আর তোরা এখনও নীরব-নিস্তব্ধ? পশুর মত কামাশক্ত, আমোদপ্রিয়?

সে-দিনটা ১০ই নভেম্বর ১৯১৭ সাল । তখন ইউরোপে প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধ চলছে । সেই রক্তক্ষয়ী মহাসংগ্রামকে উপলক্ষ্য করেই এই বাণী তা' বুঝতে কষ্ট হ'ল না । উদাত্ত কণ্ঠের এই বাণী আমাকে এবং পার্শ্ববর্ত্তী সকলকে ভাবাবেগে আপ্লুত ক'রে তুলল । কেন এ-রকম ক'রে তুলল তাঁর সে বাণীর অপূর্ব্ব স্বর-লহরী যে না শুনেছে তাকে বোঝান শক্ত ।

তারপরেই আবার বাণী নির্গত হ'তে লাগল–"যা'-কিছু হ'চ্ছে সব শব্দতরঙ্গ থেকে, চৈতন্যতরঙ্গই ব্রহ্ম । সহস্রদল থেকে বাহিরের ধারা পিণ্ডে এসেছে ।" বুঝলাম সৃজন-প্রগতিকে লক্ষ্য ক'রেই এ-কথা বলছেন ।

সেদিন তাঁর এই অবস্থা অনুমান চল্লিশ মিনিট স্থায়ী হয়েছিল । বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ব'লে উঠলেন–"জল খাবো রে, জল খাবো ।" অনন্ত-মহারাজ নিকেটই ছিলেন । তিনি পরিস্কার একটা তামার ঘটিতে জল নিয়ে এসে খেতে দিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভাবসমাধি হ'ত শুনেছি । তিনি সমাধি-অবস্থা থেকে নেমে আসবার কালে একটা পার্থিব আকাঙ্ক্ষার পূর্ব্ব মুহূর্তে "জল খাব" বা "তামাক খাব" এ রূপ কতা ব'লে সাধারণ ভূমি বা সবিকল্প অবস্থায় নেমে আসতেন । এ-দিক দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে শ্রীলামকৃষ্ণের অপূর্ব্ব মিল দেখতে পেলাম । কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদের সমাধি অবস্থায় কোন কথাই বলেননি ।

কিন্তু কেন? এই প্রশ্নই মনে জাগল । নির্বিকল্প সমাধিতে যেখানে জ্ঞান, জ্ঞেয় জ্ঞাতা সবই লয় হ'য়ে, নিজের অস্তত্বের কোন বোধই থাকে না ব'লে শোনা যায় শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, নুনের পুতুলের সমুদ্র মাপতে গেলে যে অবস্থা হয়, সে অবস্থায় কথা বলা সম্ভব কি ক'রে? মনে হ'ল, তা' একমাত্র সম্ভব হ'তে পারে যদি নুনের পুতুল না হ'য়ে পাথরের পুতুল হওয়া সম্ভব হয় । শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধি অবস্থায় একজন দর্শকের

মনে যখন এরূপ প্রশ্ন জেগেছিল তখন সমাধি-অবস্থায়ই তিনি বলেছিলেন "ভাবের চরমে, 'আমি' পৃথক রাখলে কথা বলা যায়।" বলা বাহুল্য, সমাধি অবস্থা তাঁর এই উক্তি আমারই প্রশ্নের বা চিন্তার সমানার্থ-দ্যোতক।

মহাভারতের কথাও মনে হ'ল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে যোগযুক্ত অবস্থায় গীতা বলেছিলেন। যুদ্ধের অবসানে অর্জ্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণকে বলেন যে, 'তখন তুমি আমাকে যে 'গীতা' উপদেশ করেছিলে সে আমার বিশেষ কিছু মনে নেই। এখন আর একবার দয়া করে গীতার কথা আমাকে বল।"

তার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন "তখন আমি সমাধি-অবস্থাতে তোমায় 'গীতা বলেছিলাম, এখন আমার সে অবস্থা নয়, কাজেই তোমাকে আর 'গীতা' বলতে পারব না। তবে গীতার সারমর্ম্ম কি তা' তোমাকে শোনাচ্ছি।" এই ব'লে তিনি অর্জ্জুনকে তখন বললেন, তা 'অনুগীতা' নামে প্রসিদ্ধ।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হ'ল। সমাধির পর তাঁকে খুব ক্লান্ত বোধ হ'ল। যেন একটা প্রলয়ঙ্কর ঝড় তার দেহের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। অনন্ত-মহারাজকে বেষ্টন করে তার গলায় হাত দিয়ে তিনি ঘরের মধ্যে এসে বসলেন। আমিও তার পাশে এসে বসলাম। কিন্তু তখন তার এই অপূর্ব্ব অবস্থার কথা আমার মনে হ'তে লাগল।

তাঁর এই ভারসমাধি সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নই মনে উঠল। কিন্তু তখন তাঁর শরীরের অবস্থার কথা বিবেচনা ক'রে কোন প্রশ্ন ক'রলাম না। বেশ কিছুক্ষণ পরে তিনি সুস্থ বোধ ক'রলে আহারের আয়োজন ক'রে তাকে খেতে ডাকা হ'ল। তিনি খেতে গেলেন তাঁর আহারাদি শেষ হ'লে আমাদের খাবার ডাক পড়ল। আহারাদি শেষ ক'রে এসে তাঁর শয্যাপার্শ্বে বসলাম। তখন দেখলাম, তিনি স্বাভাবিকভাবেই কথাবার্ত্তা বলছেন।

সুযোগ বুঝে তাঁকে প্রশ্ন ক'রলাম- "আপনার যে-অবস্থা কিছুক্ষণ পূর্ব্বে দেখলাম, এটা কী? একেই কি সমাধি অবস্থা বলে? সাধনার চরমে কি এই অবস্থা হয়?"

উত্তরে তিনি বললেন–"আমার এই অবস্থার কথা যদি জিজ্ঞাসা করেন তাহ'লে আমি কিছুই বলতে পারব না। আমি অচৈতন্য অবস্থায় যা বলি তার জ্ঞান আমার থাকে না। ঐ-অবস্থায় যে-সব কথা বলি বা বলেছি, সেজন্য আমি দায়িত্ব নিতে পারি না। আমি সহজ বা স্বাভাবিক অবস্থায় যা' বলি তার দায়িত্ব আমার। আমার যখন কোন জ্ঞান বা চৈতন্য থাকে না, সে অবস্থায় আমি নিজেকে দায়ী করতে পারি কি? ওটা আপনারা বিচার ক'রে বুঝবেন।"

আমি বললাম-"অবস্থাটা হয় আপনার। আপনিই যদি সেই সম্বন্ধে কিছু না বলতে পারেন তবে আমরা বিচার ক'রে কী বুঝব? এটা একটা phenomenon (দুর্লভ ঘটনা), বহুযুগ পরে পরে ক্বচিৎ কখনো সংঘটিত হয় এবং তা' শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার-কল্প পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কাজেই এসবের ব্যাখ্যা বুদ্ধি-বিচার ক'রে ঠিক করা, সাধারণ মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। আমার তো মনে হয়, এ-কথা বলবার বা বুঝিয়ে দেবার যোগ্যতা আপনারই আছে। অবশ্য আপনি যদি না বলেন, সে কথা স্বতন্ত্র।"

উত্তরে তিনি বললেন–"আমার যা' বলবার, তা' পূর্ব্বেই বলেছি।" এ-কথা নিয়ে আর কিছু না ব'লে তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম-"আচ্ছা আপনি কি একান্তে, নির্জ্জনে ব'সে সাধনা ক'রেছেন?

উত্তরে তিনি যা' বললেন তা' যেমন চমকপ্রদ তেমনি অনন্য সাধারণ। কোন মাহাপুরুষ বা অবতার-পুরুষের জীবনে এরকমটি ঘটেছে ব'লে আমার জানা নেই। তিনি বললেন যে, একান্তে, নির্জ্জনে ব'সে তিনি সাধনা করেননি। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে সৎনামের প্রকাশ তাঁর মধ্যে হ'য়েছিল এবং তিনি অহর্নিশি এই নাম জপ ক'রতেন এবং তিনি ভাবতেন যে, প্রত্যেকের ভিতর সৎনাম এমনি স্বাতঃস্ফূর্ত্তভাবেই প্রকাশিত হয় এবং প্রত্যেকে বোধহয় এই নাম তাঁর ন্যায় দিবানিশি জপ করে। বড় হলে তাঁর এই ভ্রম দূর হয়।

তিনি বললেন, যে বাল্যকালে জগন্মাতা কালী, শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য দেবদেবীরা দিব্য-জ্যোতিতে তাঁকে দর্শন দিতেন, তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতেন। কখনও কখনও জ্যোতির অপরূপ প্রকাশ ও অনাহত নাদধ্বনি শুনে তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হ'য়ে পড়তেন। নাম জপ ক'রতে ক'রতে শরীরের তাপ এত বেড়ে যেতে যে শরীরে জলবিন্দু পড়লে তা' বাষ্প হ'য়ে উড়ে যেত। যোগীজন-দুর্লভ সাধন-জীবনের এই সব অনুভূতি তাঁর, বাল্যকালে হ'য়েছিল তাঁর সে সব অনুভূতির বর্ণনার কথা স্মরণ ক'রলে এখনো আমার শরীরে রোমাঞ্চ হয়।

তাঁর এই সব বর্ণনা শুনে আমি স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। মুখে কোন বাক্‌স্ফূর্ত্তি হ'ল না, কিছুক্ষণ এইভাবে ব'সে থেকে আমি পুনরায় বললাম–'আপনার কথা অবিশ্বাস ক'রছি না, কিন্তু একটা সংশয় আমার জাগছে। তা' আপনাকে খোলাখুলি না ব'লে পারছি না।

'শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন পর্য্যালোচনা ক'রলে দেখতে পাই যে, তাঁর জীবনের প্রথম ভাগের তাঁর পরবর্ত্তী দিব্য-জীবনের তেমন আভাস নেই, গয়াধামে পিতৃকার্য্য সম্পাদনে যাবার পর থেকে তাঁর দিব্যজীবনের বহিঃপ্রকাশ এবং সন্ন্যাস-জীবনের পর থেকে তা' পরিপূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ভগবান্ শ্রীবুদ্ধদেবের জীবনে দেখতে পাই যে, ২৯ বৎসরে গৃহত্যাগ ক'রে কঠোর সাধনা অতিবাহিত করার পর তাঁর দিব্যজীবনের প্রকাশ। ভগবান্ যীশু জীবনের ১২ হ'তে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত ইতিহাস অজ্ঞাত। অনেকে বললেন,

সেইসময় তিনি যোগ শিক্ষার জন্য ভারতে এসে, কঠোর সাধনা করেছিলেন। এই কঠোর সাধনার ফলস্বরূপ ৩০ বৎসর বয়সে তাঁর দিব্যজীবনের আরম্ভ। হজরত রসুলের প্রথম জীবনে আমরা তাঁর পরবর্ত্তী দিব্যজীবনের কোন ইঙ্গিত পাই না। আধুনিককালে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে, দিব্যজীবনের প্রকাশ প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয়, যখন তিনি দক্ষিণেশ্বরে কালীমাতার পূজারীরূপে নিযুক্ত হন। আর আপনি বলছেন যে জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আপনি নাম ক'রতেন, অনেক জ্যোতির্ম্ময় দেবদেবীর দর্শন পেতেন এবং আপনার সাথে তাঁরা কথা বলতেন, জ্যোতির অপূর্ব্ব বিকাশ হ'তো এবং অনাহত নাদধ্বনি শুনে আপনি অচৈতন্য হ'য়ে পড়তেন। কোনরূপ সাধনা ব্যাতিরেকে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে দিব্যজীবনের এরূপ অপূর্ব্ব প্রকাশ কোথাও দেখতে পাই না ব'লেই মনের এবং সংশয়।'

উত্তরে তিনি বললেন–"আমি নিজেকে কোন অবতার পুরুষ বা মহাপুরুষ ব'লে জানি না। তাঁদের সঙ্গে আমার ন্যায় মূর্খ এবং নগণ্য ব্যক্তির তুলনাও অন্যায় ব'লে মনে করি। আমি-আমিই। আমার নিজের জীবনে যা' ঘটেছে, তাই আপনাকে বলেছি। কারও সঙ্গে আমার জীবনের অভিজ্ঞতা যদি না মেলে, তাহ'লে আমি কি ক'রতে পারি বুলন!'

মনীষী কারলাইলের 'Hero Worship' বইতে পড়েছিলাম যে 'Great men are unconsciously great' এটা কি তারই একটা উদাহরণ? অবশ্য এ কথা মনে-মনেই ভেবেছিলাম।

এ-কথা হবার পরই তিনি শয্যা নিলেন, আমিও উঠে প'ড়লাম। পরের দিন আহারাদির পর অপরাহ্নে শ্রীশ্রীঠাকুর ও কীর্ত্তনের দলের সাথে আমরা কমলাপুর রওনা হ'লাম। রাতুলপাড়া থেকে কমলাপুরের ব্যবধান অনুমান তিন মাইল। সারাপথ কীর্ত্তন ক'রতে ক'রতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রভূষণ বিশ্বাসের বাড়ীতে এসে পৌঁছলাম।

সুরেন্দ্রভূষণ গ্রামের প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার। তা'ছাড়া তাঁর পিতৃদেব রেশম, পাট, ধান, চৈতালীর কারবারে প্রভূত ধন সঞ্চয় ক'রে রেখে গেছে। তখনকার দিনে তাঁর পিতৃদেব কলকাতার একজন নামী সওদাগর ছিলেন। চিৎপুরে গঙ্গার ধারে তাঁর গদিঘর ছিল। অল্প বয়সে প্রভূত অর্থের ও প্রভূত জমিদারির মালিক হওয়াতে তিনি বিলাস-ব্যসনে প্রভূত অর্থ ব্যয় ক'রতেন। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে তিনি গ্রামে বাস ক'রতেন এবং তাঁর দাপটে পুলিশ কর্ম্মচারীরাও সন্ত্রস্ত থাকতেন।

সুরেন্দ্রভূষণ, গিরীন্দ্রভূষণ দুই ভাই কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের সৎমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষা গ্রহণের পর সুরেন্দ্রভূষণের চরিত্রের আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

কমলাপুরে পৌঁছেই তাঁর সাথে আমার প্রথম আলাপ পরিচয় হয়। তাঁর সৌজন্যে, তাঁর বিনয়-নম্র ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হ'লাম। ভাবতে লাগলাম–যে দাম্ভিক, জেদী, উদ্ধত-প্রকৃতির সুরেন্দ্রভূষণের কথা শুনেছিলাম, সেই ব্যক্তিই কি এই সুরেন্দ্রভূষণ? পূর্ব্বে যে সুরেন্দ্রভূষণের কথা লোকমুখে শুনে তাঁর সম্বন্ধে একটা বিরূপ ধারণা আমার মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়েছিল, তাঁর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ে সেই ধারণার আমূল পরিবর্ত্তন ঘ'টে গেল। ভাবলাম, যাঁর মোহময় অমৃতস্পর্শে চরিত্রের এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন, তিনি না জানি কত মহান, কত বিরাট পুরুষ। সুরেনদার চরিত্রের অত্যদ্ভুত পরিবর্ত্তন, দেখে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি আমার শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি আরো দৃঢ়তর হ'ল এবং সেটাই আমার পরমলাভ।

কমলাপুর থেকে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম 'দুধকুমড়া'তে অশ্বিনীদা (বিশ্বাস) ও অবিনাশ বসুর বাড়ীতে আমরা গিয়েছিলাম। কমলাপুরেও কীর্ত্তন হ'য়েছিল কিন্তু সে কীর্ত্তনে শ্রীশ্রীঠাকুর যোগ দেননি। কমলাপুর হ'তে শ্রীশ্রীঠাকুর সহ আমরা কুষ্টিয়ায় এলাম। কুষ্টিয়ায় এসে তৎপরদিনই শ্রীশ্রীঠাকুর পাবনায় চ'লে গেলেন এবং আমিও কলকাতায় চ'লে এলাম। এই কয়দিন তাঁর ও সৎসঙ্গী ভাইদের সাহচর্য্যে যেন এক আনন্দলোকে বিচরণ ক'রেছিলাম। কি ক'রে যে দিন-রাত কেটে যেত তা' বুঝতেই পারতাম না। তাঁর প্রীতির ধারায় স্নাত হ'য়ে শরীর ও মন অপূর্ব্ব শান্তিরসে অভিষিক্ত হ'ল, যা' এর পূর্ব্বে কখনো অনুভব করিনি। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট থেকে বিদায় নিতে খুবই কষ্ট বোধ ক'রলাম। একবার ভাবলাম, তাঁর সাথে পাবনাতেই চ'লে যাই। অনেক বুদ্ধি-বিবেচনা ক'রে সে-বারের মত মনকে নিরস্ত ক'রলাম।

কলকাতায় তখন আমি বাগবাজারে নন্দলাল বসু লেনে থাকতাম। ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের সময়, বোধহয় বড়দিনের দু'-একদিন পূর্ব্বে, হঠাৎ একদিন অপরাহ্নে গঙ্গার ধারে বেড়াবার জন্য বাইরে এসে দেখি, বাড়ীর সামনে শ্রীঅনন্ত-মহারাজ ও গোঁসাইদা দাঁড়িয়ে আছেন।

তাঁদের হঠাৎ দেখে স্তম্ভিত হ'যে গেলাম। ভাবলাম, এঁরা, এখানে এলেন কিরূপে? পূজ্যপাদ গোঁসাইদা আমাকে জড়িয়ে ধ'রলেন এবং বললেন-'আমরা তোমার খোঁজেই এখানে এসেছি। শ্রীশ্রীঠাকুরও এসেছেন। কাল আমরা সকলে মজিলপুরে বিরাজদার (ভট্টাচার্য্য) বাড়ীতে যাচ্ছি। তোমাকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।'

আত্মস্মৃতি
নিজ জীবন প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর

(পূর্ব প্রকাশের পর)

২৩শে আষাঢ় সোমবার, ১৩৪৮ সাল (ইং ৭/৭/৪১)

শ্রীশ্রীঠাকুর–সকালে বাঁধের তাসুতে। ধীরেণ চক্রবর্ত্তী-দা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বসা। শ্রীশ্রীঠাকুরের দেওয়া কয়েকটা ছড়া পড়তে বললেন,–শ্রীশ্রীঠাকুর ছড়াগুলির তাৎপর্য্য নিয়ে বুঝিয়ে বলছেন।...একটা ছড়া পড়া হ'ল–

কাম আবেশে স্ত্রী পুরুষে
যেমন করে উপভোগ
ইষ্টকাজে বাস্তবতায়
তেমন হ'লে তবেই যোগ।

পড়ার পরেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন– ইষ্টের কাজ করতে যদি কষ্ট বোধ হয়, বুঝতে হবে কোন passion (প্রবৃত্তি) unwilling (অনিচ্ছুক) আছে, uninterested (অনন্বিত) আছে। প্রকৃত যোগ হয়নি। আর সত্যিই কামের নেশার মত লাগে, কাম চক্ষু গজায়। ইঞ্জিনটা(আশ্রমস্থ) একটা বিশিষ্ট স্থানের একটা গাছ,–চারদিকের সব যেন একটা লোলুপ দৃষ্টিতে উপভোগ করতাম। মা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব যেন ঝম্ করে নিভে গেল। আগে কত ভালো লাগত এখন সব আনন্দের মধ্যেও মা'র ব্যথা ভুলতে পারি না। জীবনে এক বৈষ্ণবী দেখেছি, আর দেখেছি এক সাধু, অমনটা আর দেখলাম না। বৈষ্ণবী' সে 'সে' বলতো, আমাকে অত্যন্ত আদর করতো। মাঝে মাঝে ভাবাবেশ হ'তো। যাত্রা থিয়েটারের কায়দা নয়, একেবারে সহজ সুন্দর স্বাভাবিক। ভক্তি বিরহ ব্যাকুলতার একটা অনুপম অভিব্যক্তি দেখেছি তার, চলনটাই ছিল উপদেশ।...কোনদিন আমার খাওয়ার আগে খেতে বসলে জানতে পেলেই খাওয়া ফেলে উঠে যেত। সাধু আমাকে না খাইয়ে নিজে কিছু খেত না, কাউকে কিছু খেতে দিত না। মানুষ পয়সা দিলে প্রয়োজন মাফিক দু' এক পয়সা নিত, আর সব ফেলে রেখে যেত...। যাবার দিন এমন চাউনি চেয়ে গেল যে, আমার বুকখানা যেন ভিজিয়ে দিয়ে গেল। বাচ্চা, আবার দেখা হবে। [আঃ প্রঃ ৩য় খণ্ড]

...এখানে যারা আছে সবাই যে আমাকে ভালবেসে আছে, তা' মনে করবেন না। এমন লোকের অভাব নেই যারা আমাকে ভগবান ব'লে প্রচার করে, কিন্তু স্বার্থ ও অভিমানে আঘাত লাগলে তৎক্ষণাৎ আমার interest (স্বার্থ) sacrifice (ত্যাগ), করতে পারে। যারা প্রবৃত্তির দায়ে হামেশা আমার interest (স্বার্থ) করে, বুঝবেন তারা আমাকেও যে কোন মুহূর্ত্তে অস্বীকার করতে পারে, ত্যাগ করতে পারে। কথাগুলি কঠোর মনে হচ্ছে, কিন্তু এ হচ্ছে আদৎ ব্যাপার। বাড়ীর পোষা ময়নাটার উপর যে প্রীতি ও মমতা হয় আজীবন যজন যাজন ইষ্টভৃতি করেও অনেকের ইষ্টের উপর সে প্রীতি ও মমতাটুকু হয় না। তাই সব চলনটাই হয় কেমন যেন কৃত্রিম। উপস্থিত একটি মায়ের দিকে চেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর রহস্য ক'রে বললেন– আমি যদি মানুষ না হয়ে টাকা হ'তাম, তা'হলে তোর ভালবাসা লুফে নিতে পারতাম!

উক্ত মাটি–আপনি কি যে কন।

শ্রীশ্রীঠাকুর–(হাসতে হাসতে) মাঝে মাঝে অপ্রিয় সত্য কথা কই। সেটা আমার দোষও কইতে পার, গুণও কইতে পার। যখন দেখি, মোলায়েম করে সত্য কথা কইলে তোমাদের অনেকের চামড়া ভেদ করে না তখন দায় ঠেকে তোমাদের ভাল চেয়েই একটু একটু কড়া কথা কই। তোমাদের কাউকে প্রয়োজনবশতঃ রূঢ় কিছু বললে– আমার যে কী লাগে তা যদি তোমরা বুঝতে? [আঃ প্রঃ ৩য় খ-]

৭ই ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৪৭ সাল (ইং ১৩/৮/৪০)

হিমাইতপুর

গতরাত এগারটা সাড়ে এগারটার সময় টের পাওয়া গেছে যে শ্রীশ্রীঠাকুরের সুপারীর কৌটায় কে নাকি বিষ রেখে গেছে। সুপারী খেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর যারপরনাই অসুস্থ হয়ে পড়েছে–এই রকম একটা ভীষণ মারাত্মক ষড়যন্ত্র ঘটে গেছে অথচ শ্রীশ্রীঠাকুর কেমন নিরুদ্বিগ্ন মনে সহজভাবে গল্প করছেন।

আজ সকালে সুশীলদার সঙ্গে জাতিস্মর-কথা, ভৃগু-কোষ্ঠী ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হতে হতে বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে নানা কথা বলতে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর–আমি আমার উজাড় করে মানুষের জন্য করেছি আর মানুষ উজাড় করে আমাকে অত্যাচার করেছে । আমি তখন মাসে ৩০০০ টাকা বাইরে দিই অথচ মা মাসে ৩০০ টাকা করে আমার কাছে চেয়েছিলেন আমি তা মাকে দিতে পারিনি । এ আমার কম দুঃখ নয় । অভাবের তাড়নায় মা শেষে আমার কাছে হাত পাততে বাধ্য হতেন । আর আমি যাদের দিয়েছি তারা সেটা দান ব'লে ভাবেনি, দাবী বলে ধ'রে নিয়েছে । লিখে দেওয়ার কথাই সবাই চটে যেত,...আমার কাছ থেকে নিয়ে থুয়ে আজ আমার উপর যারা অকথ্য অত্যাচার করছে তাতে যদি তাদের খানিকটা ভাল হ'ত, তাও খানিকটা সান্ত্বনা ছিল, এতে ক'রে তারা নিজের ক্ষতি করছে যে সব চাইতে বেশী, সেই আমার মস্ত আপশোষ । ...সেবার উৎসবে দুই ধামা সোনা জোগাড় করেছিল আমি বললাম মোটরের দামের জন্য ৪০০ টাকা দিতে তাও দিল বা ।

পূর্ব্ব কথার সূত্র ধরে শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন–এমন লোকের কথাও আমি জানি যে আমাকে বিষ খাওয়াতে পারলে খুশী হয় । আমি ভাবি, কি আর করব? গোপাল (মুখার্জী), দুর্গাচরণ (সরকার) গেছে, না হয় আমিও যাব । কিন্তু পরমপিতার দয়ায় তাঁর কাজ চলতেই থাকবে । [আঃ প্রঃ ১ম খণ্ড]

২৯শে পৌষ, সোমবার, ১৩৪৯ (ইং ৫/৪/৪২)

প্রভাত সূর্য্যের দিকে মুখ ক'রে বসে আছেন শ্রীশ্রীঠাকুর, শান্ত সৌম্য ধ্যানগম্ভীর মূর্ত্তি । চোখ চেয়েই যেন ধ্যান করছেন । কোন্ অতলে তলিয়ে গেছে তাঁর মন । তবুও সহজ সচেতন সদানন্দ; পরিবেশের কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়াচ্ছে না, একেই কি বলে সহজ-সমাধি?– চৈতন্য সমাধি ?...বেলা এখন সাড়ে আটটা, আশ্রমের (হিমাইতপুর) সর্ব্বত্র আনন্দময় কর্ম্মচঞ্চল জীবন । শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছেও অনেক লোক জমায়েৎ হয়েছেন । নানা জনের নানাবিধ প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে বলতে লাগলেন...আমার পড়াশুনার জীবনে আমি যে কঠোর দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি তা আমাকে অনেকখানি ঠিক ক'রে দিয়ে গেছে । অতখানি চরম অবস্থার মধ্যে না পড়লে মানুষের কষ্ট আজ যেমন ক'রে বুঝতে পারি তা বোধ হয় পারতাম না । আমার নাম অনুকূল বটে কিন্তু জীবনের প্রায় প্রতি পদক্ষেপে আমাকে প্রতিকূলতার পাহাড় কেটে এগুতে হয়েছে । ...চিরদিন আমি ভালবাসার কাঙাল । ভালবাসার নামে যেখানে দেখি ব্যবসাদারী কাপট্য, সেখানে আমার মন খিচড়ে যায় । সত্যিকার ভালবাসা যেখানে সেখানে থাকে,–প্রিয়ের মনোমত চলন, চিন্তা, ব্যবহার ও আত্মনিয়ন্ত্রণ । আপনারা অনেকেই আমার জন্য ঢের করেন, কিন্তু নিজেদের প্রবৃত্তির গায়ে হাত দেন না । আমার জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ ও প্রবৃত্তিকে কতখানি অতিক্রম করতে পারেন, সেইটে হ'লো–ভালবাসার মাপকাঠি । কিন্তু অনেকেরই দেখি অহঙ্কার, অভিমান ও স্বার্থে এতটুকু চোট লাগলে পীরিত চটে যাওয়ার মত হয় । তাই আমার হিসাব করে আপনাদের তোয়াজ ক'রে চলতে হয় । এতে কি সুখ হয়? না আপনাদের কল্যাণ হয়? (বারান্তরে) আপনারা যদি আমার কাছে মানুষই আনেন, তবে অমনতর ভাবে প্রত্যেককে magnetised করেই আনবেন, জীবন-বৃদ্ধির-ধর্ম্মের বিধি নিয়মের অর্থাৎ তত্ত্বের ক্ষুধা যেন তাদের ভিতর ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধার মতন বা চুম্বকের চুম্বক-শক্তির মতন মাথা তোলা দিতে থাকে । তাহ'লে আমিও তা নিয়ে তরতরে হ'য়ে থাকতে পারবো । কিন্তু অমনতর না ক'রে...ভগবান টগবান কবুলিয়ে নানারূপ লোভানী দেখিয়ে আনলে কিন্তু তাদের ক্ষুধাও জাগবে না, আর তাতে কিছু হবেও না,–কারণ তারা আসবে আমার কাছে–না করে অর্থাৎ ক'রে পাওয়ার জঞ্জালকে এড়িয়ে বৃত্তি Luxury-কে উপভোগ করতে । তার ফলে তাদের জীবন-বৃদ্ধির চাহিদাগুলি আরও কাণা হ'য়ে পাণ্ডাঠাকুরদের বিগ্রহের উপর যেমন শ্রদ্ধা, যেমনতর স্বার্থ নিয়ে–নেহাৎ ভাল হলেও সেই রকম ভালই গজিয়ে উঠবে । কোন রকম ক'রে যাতে বৃত্তির উপভোগ করা যায় । ঠাকুর ঠাকুর বলে, বাঞ্ছাকল্পতরুটরু বলে, মহাজাগ্রত দেবতা ইত্যাদি ঘোষণা করে, ভড়ং টরং ক'রে মানুষের কাছ থেকে বৃত্তি উপভোগের মশলা সংগ্রহ ক'রে যা করার তাই করবে । তাতে তারাও যাবে, তাদের পারিপার্শ্বিক আর গুলিকেও নিকেশের পথে চালাতে থাকবে । "এত করে ঐ হবে তার ফায়দা । তা কি ভাল? [অমিয় বাণী ২য় খণ্ড] ।

১৫ই নভেম্বর, শনিবার (ইং ১৯১৯)

প্রাতে বিরাজদা, অশ্বিনী দা আশ্রমে পৌঁছেছেন । কথা প্রসঙ্গে বলছেন–দেখুন, যার কথা যখন বেশী বলি, যার প্রতি যখন বেশী আমার লক্ষ্য,–বাইরে থেকে এরূপ দেখেন, তার জানবেন তত বেশী necessity, তাই তার দিকে অত দৃষ্টি । আর যার কোন necessity নাই, তার প্রতি লক্ষ্য নাই । যত যার necessity or risk কমে আসবে তত তার কথা আমার মুখে কম শুনতে পাবেন । তবে এও একটা trusted circle-এর মধ্যে–যাঁরা আসেন, তাঁদের সম্বন্ধে, আর যাদের কোন impulse পাই না, তাদের জন্য ওরূপ হয় না । আবার যে আমার প্রতি এতখানি attached যেন আমার অঙ্গীভূত–আমার wishes-গুলি তার wishes–তার জন্যও হয় না । (অর্থাৎ তার জন্য বেশী লক্ষ্যও থাকে না বা তার কথাও মনে আসে না) [অমিয়বাণী ২য় খণ্ড]

২৭শে পৌষ রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর গোলঘরে বিছানায় উপবিষ্ট । আশে পাশে অনেকে । গায়ে চাদরমুড়ি দিয়ে দুর্গানাথ সান্ন্যালদা (শ্রীশ্রীঠাকুরের একান্ত ভক্ত মন্ত্র-শিষ্য, শ্রীশ্রীঠাকুরের চেয়ে বর্ষীয়ান) এলেন তাঁকে যথাযোগ্য আহ্বান জানিয়ে কথা প্রসঙ্গে–

শ্রীশ্রীঠাকুর– দুর্গানাথ-দা অসময়ে আমাদের যেভাবে রক্ষা করেছেন, সে কথা আমি ভুলতে পারি না । সুদে আসলে মডেল কোম্পানীতে বার হাজার টাকার উপর দেনার দায়ে আমাদের বিষয় সম্পত্তি যেতে বসেছিল, সেই সময় দুর্গানাথদার দানে আমরা উদ্ধার পেয়েছিলাম । আমার মাঝে মাঝে মনে হয়–আমি দুর্গানাথদার জন্য বিশেষ কিছু করতে পারিনি ।

দুর্গানাথ-দা অশ্রুপূর্ণলোচন–দয়াল, ও কথা বলে আমাকে অপরাধী করবেন না । আমার তো কিছুই নেই, সকলে মিলে আপনারটা খেয়েই তো বেঁচে আছি ।

(পরিবেশ ভাবগম্ভীর, সকলে নির্ব্বাক । ভক্ত ভগবানের পারস্পরিক একটা অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতার সুদুর্লভ আবহাওয়া সৃষ্টি হ'ল) । [আঃ প্রঃ ১০ম খণ্ড]

৩রা মাঘ, শুক্রবার, ১৩৪৮ সাল (ইং ১০/১/৪২)

শ্রীশ্রীঠাকুর একখানা বই দেখবার জন্য চশমা চাইলেন, কালিদাসী-মা চশমাটা এনে দিতে দিতে বললেন– আজ কাল কত ভালভাল ফ্রেমের চশমা বেরিয়েছে, চশমাটা বদলে নিলে হয় ।

শ্রীশ্রীঠাকুর– চশমাটা সেই কবে দিয়েছিলেন কলকাতার ডাক্তার কার্ত্তিক বোস (আমহার্ড্রষ্ট্রীটস্থ) । অনেক দিন ধ'রে ব্যবহার করছি, ছাড়তে ইচ্ছা করে না । তা' ছাড়া কার্ত্তিক বোসের একটা স্মৃতি ।

প্রফুল্ল-দাস-দা–আপনি বলেন–"দুনিয়ায় অচেতন নয় কিছুই । ইট, কাঠ, মাটি, সবই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ।"–সবই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ?

শ্রীশ্রীঠাকুর–হ্যা, হ্যা, সবই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, তবে প্রত্যেকটি রূপেরই বৈশিষ্ট্য আছে । সৎ, চিৎ আনন্দের প্রকাশ এক এক-টার মধ্যে এক-এক রকমে, এক এক পর্য্যায়ে । আর এই রকম ও পর্য্যায়গুলিকে জানা হ'ল বিজ্ঞান ।... [আঃ প্রঃ ৩য় খণ্ড]

সন্দীপনায় যে কোন লেখা পাঠাতে এই মেইল নাম্বারগুলোতে পাঠান–

E-mail: tapas.satsang@gmail.com
tkroy@rocketmail.com

শ্রীশ্রীঠাকুরের দৃষ্টিতে "কু-বিবাহ রাষ্ট্রোন্নয়নের পরিপন্থী"

ড. শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার

দার্শনিক, কবি, রাজনীতিবিদ, সমাজতান্ত্রিক, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন, সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে প্রত্যেকেই আমরা জীবনকে ভালবাসি । জীবনের স্বাভাবিক স্থিতি ও বর্ধনাকে যা ব্যাহত করে, জীবনের পক্ষে যা অস্বস্তিকর এক কথায়, জীবনের জন্য যা প্রতিকূল তা' আমরা কেউ পছন্দ করি না । জীবনের সুস্থ বিকাশের পক্ষে যা সহায়ক, জীবনের জন্য যা আনন্দময়, তৃপ্তিপ্রদ,এক কথায় যা জীবনকুল তাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত । 'অনুকূল'-এই বিশেষণ পদটি যে যুগ মহামানবের নাম-রূপের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে এক নতুন মাত্রা পেয়েছে আলোচনার শুরুতে আমরা তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি গ্রহণ করব ।

অনুকূলচন্দ্র (১৪.৯.১৮৮-২৭.১.১৯৬৯ খ্রিঃ)ঃ দেশ ও বিদেশের অগণিত অনুসারীর কাছে তাঁর পরিচিতি 'শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র' নামে । আবির্ভাবের স্থানিক পটভূমি বাংলা । উত্তরবঙ্গের পাবনা জেলা । উপমহাদেশের দীর্ঘতম এবং পুণ্য জলধারাবাহী ভাগীরথী-পদ্মার উত্তর তীর ছোঁয়া হিমাইতপুর গ্রাম ।

তীর্থ-মহিমা-বঞ্চিত পূর্ববঙ্গের গঙ্গা-পদ্মাবতীর বিশাল বিস্তারের পাশাপাশি তীরের ভয়াল ভাঙ্গাগড়া, জনজীবনের সুখ-দুঃখ, দুটি বিশ্বযুদ্ধের মৃত্যু-তাণ্ডব, উপমহাদেশ জুড়ে ধর্মের সাম্প্রদায়িকীকরণ এবং তজ্জনিত রক্তাক্ত সংঘাত, সবশেষ মাতৃভূমির রাজনৈতিক বিভাজনের ফলে সৃষ্টি বিপুলায়তন অনিকেত জনজীবনের সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশার প্রত্যক্ষ বাস-স্থাপন করেছিলেন । বাংলার সবুজ মাটিতে-স্বভূমিতে প্রত্যাবর্তনের অশ্রুসিক্ত অবুঝ আগ্রহ নিয়ে সেখানেই লৌকিক লীলাবসান তাঁর । স্বজাতি বাঙ্গালির গৌরবদীপ্ত মহত্বের পাশাপাশি তার লজ্জাকর সঙ্কীর্ণতার ইতিহাস স্মরণে রেখেও তাঁর প্রত্যয়ী প্রত্যাশা । 'বাংলা জাগলে ভারত জাগবে, ভারত জাগলে জগৎ জাগবে' । বাংলার ও বাঙালির মহৎ কিছু দেওয়ার আছে পৃথিবীতে ।'

মহাত্মা শ্রীশিবচন্দ্র চক্রবর্তী, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ । মাতা মহীয়সী সাধিকা দেবী মনমোহিনী । মা পুত্রের নাম রেখেছিলেন । 'অনুকূল' । সন্তানের নামটিকে ঘিরে মায়ের স্বপ্ন অভিব্যক্ত হয়েছিল স্বরচিত ছড়া-বাণীতেঃ

অকূলে পড়িলে দীনহীন জনে
নুয়াইও শির কহিও কথা,
কুল দিতে তারে সেধো প্রাণপণে
লক্ষ করি তার নাশিও ব্যাথা ।

ছড়া-বাণীর মর্মে মর্মে যে অসাম্প্রদায়িক ধর্মচেতনা ও দরদী মানবতা বোধের বীজ নিহিত উত্তরকালে তাই যেন পূর্ণতা লাভ করেছে অনুকূলচন্দ্রের দিব্য জীবনে, তাঁর সামগ্রিক জীবন-দর্শনে ।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশিকা পরীক্ষার তোরণ পার হয়নি । মায়ের ইচ্ছায় ডাক্তারি পড়তে ভর্তি হয়েছিলেন কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুলে । পরীক্ষার শেষ সিড়ি না পেরিয়েই গ্রামে ফিরে এসে চিকিৎসক হিসেবে কর্মজীবনের শুরু । মানুষের দেহ, মন আর জীবন ঘিরে বিচিত্র সব সমস্যার সাথে তাঁর গভীর পরিচয় ঘটে এই সময়ে । জীবনের জটিল ও বহুমুখী সমস্যার নিরাকরণী আকুতি থেকেই গড়ে ওঠে তাঁর নিজস্ব জীবন-দর্শন । দ্রষ্টা ঋষি স্বয়ংই দর্শন-মুর্ত্তি । তাঁর জীবন চলনাতেই মূর্ত হয় তাঁর দর্শন । অপরদিকে তাঁর বাণীতে, রচিত গ্রন্থে প্রতিফলিত হয়ে তার তাত্ত্বিক রূপ । শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ২২ বৎসর বয়সে স্বহস্তে লিখিত 'সত্যানুসরণ' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত (প্রথম প্রকাশ ১৯২৫ খ্রিঃ) । এছাড়া তাঁকে ঘিরে নিত্য সমাগত আর্ত জিজ্ঞাসু জ্ঞানীজনের অসংখ্য জিজ্ঞাসা এবং তাঁর উত্তর কথোপকথনের আকারে গ্রন্থরূপে প্রকাশিত । আমিয় বাণী, নানা প্রসঙ্গে (৪খণ্ড) কথা প্রসঙ্গে (৩ খণ্ড), ইসলাম প্রসঙ্গে, আলোচনা প্রসঙ্গে (এ পর্যন্ত ২১ খণ্ড প্রকাশিত), নারীর পথে প্রভৃতিতে বিধৃত তাঁর জীবন-দর্শনবাহী অনন্য সংলাপ । লোকজ ছড়ার আকারে তিনি তাঁর জীবন-চেতনার অমূল্য সম্পদ উদ্‌গীর্ণ করেছেন । ছড়ার সংখ্যা ৮৮২৯ । অনুশ্রুতি (৭ খণ্ড) গ্রন্থে এরা সংকলিত । চলার সাথী, নারীর নীতি, শিক্ষা বিধায়না, বিবাহ বিধায়না, বিজ্ঞান বিভূতি, সমাজ সন্দীপনা, বিধান বিনায়ক, প্রভৃতি বাণী গ্রন্থে তাঁর বিস্ময়কর জীবন দর্শন প্রতিফলিত । 'The massage' নামে নয় খণ্ডে সংকলিত তার ইংরেজি বাণী । Magna Dicta নামে রয়েছে তাঁর স্বয়ংসম্পূর্ণ আরও একটি ইংরেজী বাণী-গ্রন্থ । এই সব গ্রন্থ অনুকূল-দর্শনের কালজয়ী আধার । সেই সাথে এগুলি বাংলার সারস্বত ভাণ্ডারেরও অমুল্য সম্পদ ।

ছড়া, চিঠি ও কথোপকথন ভিন্ন অনুকূলচন্দ্রের অন্যান্য বাণী গ্রন্থের প্রতি লক্ষ করলে আমরা চমৎকৃত হই তাঁর বাক-শৈলী দেখে । ভাষা ও সাহিত্যে (বাংলা এবং ইংরেজীতেও) অনুকূলচন্দ্র এক অভিনব রচনা-নীতির জনক । তাঁর বাণীর বিষয়বস্তু গদ্যের কিন্তু আঙ্গিক কাব্যের । এগুলি-কাব্য নয় । কারণ আধুনিক কবিতা-সুলভ দুরুহ রূপকল্প এখানে অনুপস্থিত । প্রাবন্ধিক বিষয়বস্তুকে ঘিরে লক্ষ্যাবসারী বাণীর মনোহর কাব্যিক শরীর বিনির্মিত, অনুকূল-বাগভঙ্গির এই

অভিনব বৈশিষ্ট্যকে রীতি-তত্ত্বের বিচারে 'অনুকূল-রীতি, বলা যেতে পারে। সাহিত্যের অনুসন্ধিৎসু গবেষকদের জন্য এ নিয়ে পৃথক গবেষণার সুযোগ আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শবাহী সঙ্ঘের নাম 'সৎসঙ্গ'। 'সৎ' কথাটার মুলে রয়েছে অস্ ধাতু। যার অর্থ অস্তিত্ব। সৎসঙ্গ তাই অস্তিবৃদ্ধিতপা সংগঠন। সৎসঙ্গ চায় মানুষ। সাম্প্রদায়িক জাতি গোষ্ঠীর উর্দ্ধে বিশ্বজনীন মানবতা তার কাঙ্ক্ষিত। ভু-রাজনৈতিক সীমা ছাড়িয়ে সে চায় এক 'পরম রাষ্ট্রিক সমবায়' পৃথিবীর সব দেশের সমবায়ে একটি বিশ্বজননী রাষ্ট্রকাঠামো। সমৃদ্ধ জাতীয় জীবনের কথা ভাবতে গেলেই সুস্থ-শান্তিময় পরিবার গঠনের পরিকল্পনাটি নিতেই হবে। বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে একটি পুরুষ ও একটি নারী আবদ্ধ হ'য়ে স্বামী-স্ত্রী রুপে পরিবার গড়ে তোলে।

দৃষ্টি মানে দেখা। জীবন জগতের তত্ত্ব ও সত্যের স্বরুপকে দেখা। জীবন ও জগতের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও সত্যের স্বরূপ নির্ণায়ক শাস্ত্রই হল দৃষ্টি বা দর্শন। পাশ্চাত্য প্রতিশব্দ Philosophy আভিধানিক অর্থ জ্ঞানানুরাগ। জ্ঞান মানে জানা। জানার ইচ্ছা জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসার উৎস বিস্ময়, জগৎ ও জীবনের রহস্যকে ঘিরে বিস্ময়। 'বিস্ময়ই দর্শনের জনক'। এই অভিমত গ্রীক মনীষী প্লাটোর। প্রাচীন ভারতীয় দর্শন, সাংখ্যের অভিমত হল, 'দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ।' ত্রিবিধ দুঃখের অভিঘাত থেকে জিজ্ঞাসার জন্ম। কেমন করে দুঃখের আঘাত থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যায় এটি জীবনের এক মৌলিক প্রশ্ন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন–

"দৃশ-ধাতু থেকে নাকি দৃষ্ট বা
'দর্শন' কথার উৎপত্তি হয়েছে,
তুমি দেখে'সুঝ-বুঝে
যেগুলি
বাস্তব সঙ্গতি নিয়ে বোধ কর–
বোধ দৃষ্টি নিয়ে
সেগুলিকে বিন্যাস কর,
বিন্যাস করে
বাস্তব ফলে যা পাও–
তাই দর্শন,"
এবং বাস্তব দৃষ্টি,
অনুকূলের দৃষ্টিতে বা
শ্রীশ্রীঠাকুরের দৃষ্টিতে।

দর্শনের সংজ্ঞা নির্ধারণী তাঁর একটি ইংরেজী বাণীর উদ্বৃতি দিয়েই আমরা প্রসঙ্গান্তরে যাব–

Factual materialistation
and the discernment of facts
with meaningful adjustment
and loving enthusiasm
are practical philosophy
hence, philosophy is
love for knowledge.
(The message, Vol VIII, Page-127)

এখানেও তথ্যসমৃদ্ধ বাস্তবতা এবং তথ্যবিশ্লেষণী অন্তদৃষ্টির সাথে সঙ্গতিশীল বিনায়না এবং প্রেমল উদ্দীপনাকে যথার্থ দর্শনের প্রাণবস্তু বলে বর্ণনা করেই বলা হয়েছে– সেই জন্যই বলা হয়–দৃষ্টি বা দর্শন হল জ্ঞানানুরাগ। শিক্ষা, কৃষি, শিল্প এবং সুপ্রজননের নিমিত্ত সুবিবাহ এখানে অস্তিত্বের চারিস্তম্ভ (Four pillars of existence) রুপে বর্ণিত। অনুকূল দর্শনে তাই ধর্মচর্যার মাঝে ইষ্টানুগ কর্মানুশীলনের এক বিপুল আয়োজন। এর প্রস্তাবনা–শিক্ষার সাথে ইষ্টানুচর্যাকে সম্পৃক্ত করতে হবে। প্রাচীন তপোবনের শ্রদ্ধানুসৃত শিক্ষার প্রবর্তনা প্রয়োজন। মাতৃ-পিতৃ-ভক্তির মধ্য দিয়ে শিশু জীবনে যে মানবিক মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটে, আচার্য-নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তারই ঘটবে বিশ্বজনীন বিবর্তন। সন্তানের জীবনে শ্রেয়-শ্রদ্ধা সঞ্চারণার পূর্ব-শর্ত হচ্ছে, ইষ্টানুগ প্রেমোচ্ছল দাম্পত্য জীবন। সুবিবাহ (শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষায় **Campatible Marriage**) হচ্ছে সুন্দর দাম্পত্য জীবনের প্রাক্ শর্ত। বিবাহের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়েই ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য, বংশগতি, বর্ণ ইত্যাদিও বিবেচ্য। বর্ণ হচ্ছে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সমাজ জীবনের কর্ম-পরিকল্পনা (তথাকথিত জাতিভেদ নয়)। ইষ্টকেন্দ্রিক দাম্পত্য জীবনের পুণ্য ক্ষেত্রে শুভ সম্ভাবনাদীপ্ত যে মানব শিশুর আবির্ভাব হবে ইষ্টানুগ শিক্ষা ব্যবস্থাই তাকে ব্রাহ্মী ব্যক্তিত্ব অর্জনে সহায়তা দেবে। নারী-পুরুষ তাদের পরস্পরের ভাবজগৎকে নিয়ে, ইষ্টকে কেন্দ্র ক'রে, যখন একটি ভাবজগত সৃষ্টি ক'রে সানন্দে এবং সন্তোষের সাথে একে অপরের পরম সুহৃদ্রুপে বাস করতে পারে, তখনই সার্থক হয় সে বিবাহ। গার্হস্থ্যাশ্রমে দাম্পত্য জীবনকে কেন্দ্র করেই নবজাতকের আবির্ভাব ঘটে। এই নবজাতক বা জাতিকারাই দেশের মানুষ। সমাজের বা জাতির সমস্যা মানেই সুস্থ মন অপরিহার্য। সুস্থ দেহ মনের প্রথম ভিত্তি প্রস্তুত হয় জন্ম-মুহূর্তে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মনের সংমিশ্রণে যে ভাবভূমি তৈরী হয় সেইটিই তো জাতক। জাতিকার মৌলিক ভাব ভিত্তি। এই ভাব যত পরিচ্ছন্ন ও উন্নত, সুস্থির শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালবাসায় সঞ্জীবিত, জাতক/জাতিকা তত উচ্চতর মানবিক সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাই বিবাহ যা'তে ব্যক্তি-দম্পতি-গৃহ-সমাজ-রাষ্ট্রের কল্যাণসম্মত হয় তারই জন্য, এক্ষেত্রে এত বিচার, এত নিরীক্ষা, এত বিধিনিষেধ। পুরুষের পূরণ-শক্তি ও নারীর পোষণশক্তি যা'তে অবিকৃতভাবে কাজ করতে পারে তার জন্য বর্ণ-বংশ-গোত্র-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-রুচি-মেজাজ প্রভৃতির

সাদৃশ্য দেখেই বিবাহ সংঘটিত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন ।

সুসঙ্গত সমীচীনভাবে
কুল ও কৃষ্টির অভিসারণায়
তুমি যা'র বৈশিষ্ট্যকে বহন ক'রতে পার
বা যে তোমার বৈশিষ্ট্যবাহিনী
হ'য়ে চ'লতে পারে-
সুসদৃশ, সঙ্গতিশীল জীবনস্রোতা হ'য়ে–
বিবাহের মর্য্যাদা কিন্তু সেখানে ।

শ্রীশ্রীঠাকুর আরও বলেন–"দাম্পত্য প্রণয় জিনিসটা যদি না গজায়, তবে শুধু [কাম-সম্বন্ধে স্বামী বা স্ত্রীর জীবনে পরিতৃপ্তি জিনিসটা আসে না । বুকের মধ্যে থাকে একটা হা-হা-কার ও শূণ্যতা । সবগুলি প্রবৃত্তিই হয়ে উঠে উগ্র । তারা নিজেরাও শান্তি পায় না, কাউকে শান্তি দিতেও পারে না । নিস্তেজ এবং হতবল হ'য়ে পড়ে, স্ফূর্তি থাকে না, আনন্দ থাকে না, রুগ্ন, কুটিল ও ইন্দ্রিয়পরবশ হ'য়ে পড়ে সন্তানাদিও ঐ ধারা ধরে । মানুষের-আদর্শ নিষ্ঠা ও দাম্পত্য জীবন এই দুটো দিক যদি ঠিক থাকে তা'হলে অনেকখানি বাচোয়া । এর ভিতর দিয়েই কামের সুনিয়ন্ত্রণ হয় । কাম নিয়ন্ত্রিত হ'লে অন্যান্য প্রবৃত্তিগুলিও পথে আসে । তাই দীক্ষা ও বিয়ে এদুটো বিধিমাফিক হওয়া চাই । বিবাহের মত শ্রেষ্ঠ সামাজিক মলিনের মধ্যে যাতে কোন প্রকার বিচ্ছেদের বীজ না থাকে-মিলন যা'তে সারা জীবনের জন্য অটুট এবং অবিচ্ছেদ্য হয় সেদিকে অতি সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন ।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন–"শয়তানের তহবিলে যত পাপ আছে বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং অন্যের পরিত্যক্ত স্ত্রী গ্রহণ তার মধ্যে সর্পিলতম, যা পরিবার, সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রকে বিকেন্দ্রিক বিভ্রান্ত ব্যতিক্রমে পরিচালিত ক'রে বিবর্তন-ব্যাহতির ক্ষয়িষ্ণু তাৎপর্য্যে ক্রমপদবিক্ষেপী ক'রে তোলে ।

বিবাহ-বিচ্ছেদ ভাল না, তার পরিণাম ভয়াবহ । পরিবারে ও সমাজে এখনও যে সুখ শান্তি আছে তা আর থাকবে না । অচ্ছেদ্য বন্ধনের বদলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আসবে সন্দেহ ও অবিশ্বাস । পরস্পরকে স'য়ে ব'য়ে সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, পরিবার পরিবেশ সকলের প্রতি মমতাবদ্ধ হ'য়ে সারা জীবন মিলিত সত্তা নিয়ে সংসার করার পরিকল্পনা উঠে যাবে, তাই ভালবাসার শিকড় গাড়ার সুযোগ পাবে কম ।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের দৃষ্টিতে স্বদেশ বিষয় নিয়ে লিখতে যেয়ে প্রথমেই মনে হচ্ছে সোনার বাংলার সেই গ্রামটির কথা যেখানে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন । সে গ্রামটি হলে পাবনা জেলার হিমাইতপুর গ্রাম । পল্লী বাংলার পদ্মা নদীর তীরের এই অতি সাধারণ গ্রামটিই অনন্যসাধারণ, এক-মেবাদ্বিতীয়ম শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মস্থান ও দীর্ঘ আটান্ন বছরের লীলাভূমি নিজের গ্রাম, নিজ মাতৃভূমির কথা পরম শ্রদ্ধায় তিনি উচ্চারণ করেছেন । তাঁর বহু বিশদ কথোপকথনের মাঝে কতবারই সে প্রসঙ্গ এসেছে । একবার পরম আবেগভরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন,– "কত ভাগ্যে সোনার বাংলায় জন্মলাভ করেছি, ইচ্ছে করে এর ফল জল, আলো-হাওয়া, খাদ্য-খাবার, স্নেহ-প্রীতি প্রাকৃতিক মাধুর্য্য প্রাণ ভরে উপভোগ করি ।

এ আমার গোঁড়ামি কিনা বলতে পরি না, কিন্তু আমার মনে হয়, বাঙ্গালীর মহৎ কিছু দেবার আছে জগৎকে । বাংলা জাগলে ভারত জগবে, ভারত জগলে জগৎ জাগবে, (আঃ প্রঃ ৩/১৬১) শ্রীশ্রীঠাকুরের এই উক্তির মাধ্যমেই মাতৃভূমির প্রতি তাঁর ভাবনার চিত্রটি প্রতিফলিত । বাংলায় তাঁর জন্ম, আর ভারতের একটি রাজ্য বাংলা । তাই ভারতের জন্য ও তার চিন্তার অন্ত নেই । স্বদেশ প্রীতির এই স্রোত ভারত পর্যন্ত এসেই থেমে থাকেনি । তা পরিপ্লাবিত হয়েছে সমগ্র জগতের কল্যাণ কামনায় । তাই তিনি বলছেন,– "বাংলা জাগলে ভারত জাগবে, ভারত জাগলে জগৎ জাগবে ।"

আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থার দিকে চাইলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হয় । তাই বুঝতে অসুবিধা হয় না, যেখানে ব্যক্তিত্ব শতধা বিচ্ছিন্ন, যেখানে প্রকৃতপক্ষে স্ব-এরই অর্থাৎ নিজত্ববোধেরই উদ্‌বোধন হয় নি, আর সেই মানবদণ্ডে যেখানে অন্যকে বোঝার মত মনোভাবই সৃষ্টি হয়নি সেখানে দেশাত্মবোধের আশা করা যায় না । শ্রীশ্রীঠাকুরের আন্দোলন তাই 'স্ব' গুলিকে মুক্ত করার আন্দোলন । তাঁর মন্ত্রে মানুষ জাগ্রত হ'লে, নিয়ন্ত্রিত হ'লে, মানুষের প্রবৃত্তিগুলি নিয়ন্ত্রিত হ'লে ও বিনায়িত হ'লে মানুষের স্বাধীনতা আপনিই আসে । শ্রীশ্রীঠাকুর তাই সেই 'ইংরাজ হটাও' যুগে উদাত্ত কণ্ঠে বলেন, স্বরাজ বলতে ইংরাজ বিদ্বেষ বুঝি না । স্বরাজ মানে এই বুঝি-আমার নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে হ'লে যা' যা' করা উচিৎ তা যদি করতে পারি, তা'হলে সত্য স্বরাজ লাভ হয় । ভিতর এবং বাহির এই উভয় দিকই যখন স্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, তখনই প্রকৃত স্বরাজ পেতে পারি । ইংরাজ যদি শত্রু হয় সে আপনি চলে যাবে–মিত্র হ'লে সে আমাদের সঙ্গে **amalgamated** হয়ে পড়বে ।" আরও পরিষ্কার করে বলছেন, 'স্ব' এর অধীন মানুষ তখনই হয়, যখন সে মূর্ত্ত আদর্শের অধীন হয় । এটা হ'তে হবে আমাদের ।

সমষ্টিগত জীবন ব্যক্তি জীবনেরই পূর্ণ পরিণতি । আবার ঐ সমষ্টিরই নামান্তর জাতি । আবার তাদের বাসস্থানই দেশ । তাই বার বার পুরুষোত্তমের আহ্বান প্রতিটি ব্যষ্টির কাছে । বার বার তাঁর অমিয় সংকেত জাগ্রত ক'রে দিতে চায় মানুষের শুভ বুদ্ধিকে । ব'লে উঠে "মরো না, মেরো না পার তো মৃতুকে অবলুপ্ত করো ।" নানা ভাষায় মনে করিয়ে দিতে চায় জীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শকে । স্মরণ করিয়ে দিতে চায় মানুষের দায়িত্ব ও করণীয় দেশের প্রতি দশের প্রতি ।

বহু বিবাহ ঃ আর্য্য দ্বিজদিগের মধ্যে পুরুষের বহু বিবাহ প্রচলিত । 'সহন ও বহনযোগ্য উপযুক্ত বহু বিবাহে পুরুষের

শ্রদ্ধাবনত স্তুতি-উদীপ্ত সেবা ও প্রতিষ্ঠা প্রয়াসোদ্বুদ্ধ বহুনারী গ্রহণে ঐ উপযুক্ততা মাফিক সংস্কার ও ধারাবাহী প্রজনন ও বেশী হ'তে থাকে । তা'র ফলে সুপ্রজাত জনগণের বহু সৃষ্টি হ'য়ে সমাজ ও জাতিকে উন্নত নিয়ন্ত্রণে অক্ষুণ্ন ও অবাধ উন্নতিতে চ'লে চালাতে থাকে । সমাজ এমনতর বহু বিবাহ থাকার দরুণ নারীর উন্নতিতে আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াস থাকায় সে উন্নত ব্যক্তিকেই বিবাহ ক'রে থাকে ।' (শ্রীশ্রীঠাকুর)

পুরুষের বহু বিবাহটা একেবারে নিষিদ্ধ করে দেওয়াটা বিপজ্জনক । অন্য সব দিক বাদ দিয়েও অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ যে ক্ষেত্রে শুভ ফলপ্রদ তাহা যদি বজায় রাখতে হয় তবে বহু বিবাহের প্রচলন থাকা প্রয়োজন । তবে পুরুষ যদি সবর্ণ বিবাহ না ক'রে অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ করে তা'হলে তা'র বর্ণ ও বংশোচিত মৌলিক বিশুদ্ধ ধাঁজটা সন্ততি ধারার মধ্যে রক্ষিত হইবে না । সেটা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক । অতএব সবর্ণ বিয়ের ভিতর দিয়ে মুলটা ঠিক রেখে অনুলোমক্রমে পুনর্বিবাহ করলে শুভবৈচিত্র্যের আগমন ঘটবে । তা ছাড়া জাতটাকে একগাট্টা করতে হলেও এমনতর বহু বিবাহের প্রয়োজন । (৮)

বিবাহে বয়স ঃ বিবাহের সময় পাত্র-পাত্রীর বয়সের তারতম্য ১৫/২০ বছর হওয়া আবশ্যক পাত্রী যদি পাত্র অপেক্ষা এমনতর বয়সে ছোট না হয় তবে

উভয়ের গায়ের রং আর স্বভাবের রং
করণ, কারণ, চালের রং
নিজের সাথে মিলিয়ে বিয়ে
করলে পাবি পিষ্ট ঢং । -শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকুলচন্দ্র ।

মধ্যে বয়সানুপাতিক জ্ঞানের সমতা থাকে– সাধারণতঃ স্বামী তার অনুসরণীয় হয় না । আবার পুরুষের পিতৃত্বের উদ্বোধনযোগ্য বয়স না হইলে সে যদি স্ত্রী গ্রহণ করে, তবে অপুষ্ট অসুস্থ সন্তান জন্মান সম্ভব । 'যাহোক অবলম্বন করিয়া বাচিয়া থাকা যায়, সর্ব্ব বিষয়ে পুষ্ট হওয়া যায়- তিনি পতি অর্থাৎ পূরণ করার যোগ্যতা আছে এমনতর ব্যক্তি–অর্থাৎ পুরুষই পতি হইতে পারে । পতিতে পিতৃত্ব আছে তাই পতি ও পিতা একই ধাতু হইতে উৎপন্ন । পিতা দ্বারা **Sexually nourished** (হইতে পারে না- কিন্তু পতিতে **sexually nourished** হইবার বাধা নাই–কেবল ঐ পিতা হইতে পতির ভেদ । তাহা হইলে এমনতর পিতৃ প্রকৃতির পুরুষ যাহাতে **sexually nourished** হওয়ার বাধা নাই, তিনি পতি হইতে পারেন ।' –(শ্রীশ্রীঠাকুর) ।

যদি অন্তরচর্য্যা না থাকে–
কোন স্ত্রী বা পুরুষ
পরস্পর পরস্পরের
স্বার্থ হ'য়ে উঠতে পারে না
আর, যতক্ষণ উভয়ের সার্থকতা
একস্বার্থী না হ'য়ে উঠেছে
মিলন বা বিবাহও
কৃতার্থ হ'য়ে ওঠে না সেখানে ।

বিবাহের উদ্দেশ্য হচ্ছে উদ্বর্দ্ধন ও সুপ্রজনন । উদ্বর্দ্ধন মানে উন্নতির দিকে বেড়ে ওঠা । আর সুপ্রজনন মানে সুসন্তানের জন্ম । বিবাহের ভিতর দিয়ে উদ্বর্দ্ধন কি করে হয়, তাই-ই প্রথমে বিচার্য্য । এই প্রসঙ্গে ভেবে দেখা প্রয়োজন পুরুষ বিবাহের যোগ্যতা লাভ করে কিসের ভিতর দিয়ে । কারণ, যোগ্যতা অর্জ্জন না করে বিবাহ করা উন্নতির কারণ না হ'য়ে অবনতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় ।

আগে ইষ্টনিষ্ঠার ভিতর দিয়ে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে অর্থাৎ ছাত্রজীবনে বিহিত অনুশীলনে সুস্থ সুস্পষ্ট দেহ-মন, ধীশক্তি, সেবামুখর কর্মদক্ষতা, জিতেন্দ্রিয়তা ইত্যাদি লাভ করার পর তবেই পুরুষ বিবাহ করার যোগ্য হয় । সুকেন্দ্রিকতা নেই, সংযম নেই, ব্যক্তিত্ব নেই, কর্মশক্তি নেই, এমনতর পুরুষ বিবাহের অযোগ্য । তাই যে সে অবস্থায় বিয়ে করলে উদ্বর্দ্ধন হবে না । বিয়ে করার আগে চাই ইষ্টনিষ্ঠা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ । পুরুষের মেয়েমুখীনতা বলে দেয় যে, সে বিয়ে করার উপযুক্ত নয় । মেয়েমুখী পুরুষকে মেয়েরা কখনও শ্রদ্ধা করতে পারে না । তাই ঐ অবস্থায় বিয়ে করলে সে বিয়ে উদ্বর্দ্ধনের উৎস হয়ে উঠতে পারে না । কিন্তু পুরুষ যদি ইষ্টনিষ্ঠ হয় এবং তার বিয়ে যদি ঠিক মত হয় তবে মনোবৃত্তানুসারিণী সহধর্মীনির উদ্দীপনা ও প্রেরণায় পুরুষ তার জীবনে সব দিক দিয়েই বেড়ে উঠতে পারে । আবার ঐ উন্নত স্বামীর প্রতি সক্রিয় অনুরাগে স্ত্রী ও সার্থক হয়ে উঠে জীবনে এই হল উদ্বর্দ্ধনের প্রাথমিক কথা, এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত আছে সুপ্রজনন ।

এই উদ্বর্দ্ধন এবং সুপ্রজনন-উভয়ের জন্যই প্রধান প্রয়োজন হচ্ছে পুরুষ ও নারীর পরস্পরের বৈধানিক সংস্থিতি, কুলসংস্কৃতির মধ্যে সুগভীর সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি । তার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের চাই প্রবৃত্তি-পরভেদী শ্রেয়নিষ্ঠা যা তার ব্যক্তিত্বকে অখণ্ডতা দান করে, আর নারীর চাই অকাট্য ইষ্টানুগ স্বামী অনুরক্তি যা তাকে যোগ্য মনোবৃত্তানুসারিণী, সতী, সাধ্বী, সহধর্মিনী করে তোলে । এমনতর উর্দ্ধগ, তপোরত, শিষ্ট, পবিত্র, একাত্মপ্রবুদ্ধ দাম্পত্য মিলনের মাধ্যমেই ঘরে-ঘরে আবির্ভাব হয় ধীমান, বিদ্যাবান, বিশালহৃদয়, প্রতিভাদীপ্ত, শ্রদ্ধাবান, সুকেন্দ্রিক, কুশলকর্মা, পরার্থপর দেবসন্তানের যারা বংশ, সমাজ দেশ ও জগতের গৌরব সরূপ হয়ে ওঠে । সুপ্রজননের পক্ষে স্বামী-স্ত্রীর সর্বাত্মক সঙ্গতির গুরুত্ব শ্রীশ্রীঠাকুরের নিম্নলিখিত বাণীর মধ্যে সুপরিস্ফূট ।

"স্ত্রীর যে ভাবধারা ও যেমনতর impulse (সাড়া) দ্বারা পুরুষ স্ত্রীতে আনত হয়, পুরুষের brainoentre (মস্তিস্ক কেন্দ্র) তেমনভাবে excited (উত্তেজিত) হয়, আর সেই সময়ই ঐ ভাবের range এর (সীমার) মধ্যে যত soul

(আত্মা) in tune (ঐকতানিক সূত্রে) থাকে, তারা এসে হাজির হয়। Seroutum-এর (অন্ডকোষের) মধ্যে যে সমস্ত sperm cells (শুক্রানুকোষ) থাকে, সে সময় সেগুলি chargcd (শক্তিসম্ভূত) হয়ে নিয়ে life (জীবন) পায় অর্থাৎ ঐ আগত soul (জীবত্মা) গুলি sperm cell (শুক্রাণুকোষ) কে life (জীবন) দিয়ে চলৎশীল, নড়নশীল, সজীব করে তোলে, মানুষের শরীরে মধ্যে তখন একটা contraction (আকুঞ্চন)- এর ভাব হয়। আর স্ত্রী-পুরুষের মিলনের সময় তারা ovum (ডিম্বানু)-র সঙ্গে মেশার জন্যে ছুটে যায়। স্ত্রী আবার স্বামীর ভাবভঙ্গী থেকে, আচার ব্যবহার থেকে যেমনভাবে impressed (প্রভাবিত) হয় ova (ডিম্বানু) ও তেমনিভাবে impressed হয়, তার ভাবভূমির ভিত্তিতে দাড়িয়ে। অবশ্য পুরুষও যে স্ত্রীর ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে সে কথা তো পূর্বেই বলেছি। স্ত্রীর একনিষ্ট শ্রদ্ধাপ্লুত পরিচর্যা পুরুষকে যতখানি exalt (উন্নীত) করে তোলে, তত উন্নত স্তরের আত্মা নেমে আসে।

উচ্চতর বর্ণ বংশোদ্ভুত কন্যার যদি নিম্নতর বর্ণ বংশোদ্ভুত পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হয়, তাকেই বলে প্রতিলোম বিবাহ। শাস্ত্রে এই বিবাহকে আর্য্যবিগর্হিত ব'লে ঘোষণা করা হয়েছে। বিজ্ঞানেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। জীব-জন্তুর প্রজননের বেলায় দেখা যায় যে, সেখানে পুরুষ জাতি যদি স্ত্রী জাতির থেকে নিকৃষ্ট হয়, তাহ'লে সেই সংযোগ-সঞ্জাত জীব অতি নিকৃষ্ট স্তরের হয়। এমনকি সেই গর্ভধারিণীও নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তার উন্নত জননক্ষমতা অনেকাংশে ব্যাহত হয়। আর, এর বিপরীতক্রমে ফল সবদিকে দিয়েই শুভ হয়। বিধান এক জিনিস আর অনুসরণ আর এক জিনিস। কোন সুষ্ঠু বিধান থাকা সত্ত্বেও যদি তা' অনুসরণ করা না হয়, কিংবা তাকে যদি বিকৃত ক'রে তোলা হয়, তবে তার ফল যা' ফলার, তা' ফলেই। বিবাহের বৈজ্ঞানিক বিধান অবহেলা করার ফলেই, জাতি আজ নানাদিক দিয়ে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ছে। বিশিষ্ট মহামানবদের জন্মের সংখ্যা যাচ্ছে ক'মে এবং জনবহুল্য ঘটলেও সাধারণ মানুষের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, বৌদ্ধিক ও দৈহিক যোগ্যতার মান যাচ্ছে নেমে। এর প্রতিকার করতে গেলে চাই বিবাহকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। পৃথিবীর সর্ব্বত্র আজ মানুষের মান যাচ্ছে নেমে। সত্তাবিরোধী ও সমাজ-বিরোধী প্রবণতাগুলি সর্ব্বত্রই আজ উত্তাল হ'য়ে উঠছে। অশ্রদ্ধা, উচ্ছৃংখলতা, বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, উদ্দেশ্যহীনতা, অসঙ্গতি, অনৈক্য, প্রবৃত্তিপরায়ণতা, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, যোগ্যতাহীন দাবী-দাওয়া, কর্তব্যবিমুখতা, দায়িত্বহীন চলন, অস্থিরমতিত্ব, অব্যবস্থা, মানসিক বিকৃতি ও ব্যাধি, অশান্তি, উত্তেজনা, ধ্বংসাত্মক মনোভাব ক্ষয়িষ্ণুতা, দরদহীনতা, স্বার্থন্ধতা, ভোগলিপ্সা, আসুরিকতা ইত্যাদি মানবসমাজকে আজ অন্তঃসারশূণ্য ক'রে তুলেছে। বাইরের সব চাকচিক্যের আড়ালে মানুষ আজ ভিতরে ভিতরে ক্ষত-বিক্ষত, দগ্ধ-বিদগ্ধ, যন্ত্রণাকাতর। বহু ঋদ্ধিমান সভ্য দেশে আজ মস্তিস্কবিকৃতি, মানসিক ব্যাধি, অপরাধপ্রবণতা ও আত্মহত্যার সংখ্যা হুহু ক'রে বেড়ে চলেছে। এর একটা প্রধান কারণ যৌন জীবন ও প্রজননে গোলমাল মানুষের জৈবী-সংস্থিতি যদি বিকৃত ও বিপর্যস্ত হয়, তাহ'লে জীবনটাই তার কাছে বিড়ম্বনা হ'য়ে ওঠে। জীবনটাকে সে উপভোগই করতে পারে না। উপভোগ করবে যে শরীর মন দিয়ে, তাই-ই যে দিশেহারা ও উদ্‌ভ্রান্ত। সে যে কী জ্বালা তা' ভূক্তভোগীই জানে।

প্রতিলোম-আসঙ্গ
মেয়েদের জৈব-সংস্থিতিকে
হীনপ্রভ ক'রে
মন, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুজালকে
জঞ্জালাবৃত ক'রে তোলে যেমনতর,
পুরুষের বোধ, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুজীবনকে
হীনপ্রভ করে তেমনি,
উভয়েরই সত্তার সলীল গতি
অন্তরায়কে অতিক্রম ক'রে
স্রোতবান্ হ'য়ে উঠতে না পারায়
তা'দের জীবন
শীর্ণ ও ক্ষীণই হ'য়ে চ'লে।

সেই পরিপ্রেক্ষিতে শাস্ত্রের নির্দ্দেশ-অনুযায়ী প্রতিলোম বিবাহকে অসিদ্ধ জেনে, কোথাও প্রতিলোম বিবাহ সংঘটিত হ'লেও, তা' নাকচ ক'রে, সেই কন্যাকে শ্রেয় করে যদি অর্পণ করা যায়, তা'হলে তাই হবে ধর্ম্মদ। আর, যেখানে তা' সম্ভব না হয়, সেখানে এমন ব্যবস্থা করা দরকার, যাতে তাদের কোন সন্তান-সন্ততি না হ'তে পারে। একটা প্রতিলোম সন্তান তার সত্তাঘাতী, পরিধ্বংসী জলুস নিয়ে মানব-সমাজে যে কী বিপুল ক্ষতিসাধন করতে পারে, তার ইয়ত্তা নেই। জননবিধান যদি বিকৃত হ'য়ে যায়, তাহ'লে লোকজীবন জীবনীয় ভিত্তিহারা হ'য়ে পড়বে। আমাদের কোন প্রচেষ্টাই তখন আর কার্য্যকর হবে না। কথায় বলে 'শিরে করলে সর্পাঘাত তাগা বাধবে কোথায়?' প্রতিলোম বিবাহ হ'তে থাকলে ঠিক অমনতরভাবে জাতির শিরে সর্পাঘাত হ'য়ে যাবে। তার প্রতিকারের আর কোন পথ থাকবে না।

আবার বলি, সুজনন ও তপস্যার বিহিত ব্যবস্থা না করলে আমরা কিন্তু উন্নত হ'তে পারবে না। তাই-ই ঘরে-ঘরে শৌর্য্য, বীর্য্য, সাহিত্য, শিল্প, কলা, দর্শন, ধ্যান, মনন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কর্ম্মের নানা বিভাগে মহান দিকপালদের আবির্ভাব সম্ভব ক'রে তুলবে। তাই-ই আমাদের কুঁড়েঘরে টেনে আনবে ঋষি, মহাপুরুষ ও দেবতাকে, স্বয়ং নারায়ণকে। আজও যে আমাদের দেশে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীঠাকুর

অনুকূলচন্দ্রের মত মানুষ জন্মগ্রহণ করেন, এ কি কম সৌভাগ্যের কথা? এই যে আসেন, তার পিছনে জাতির সুচিরসঞ্চিত তপস্যা ও সুজনধারা গোপনে ক্রিয়া করে। আরো ব্যাপক ও বৈজ্ঞানিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে যাতে সুৎসতি-সৃজনী প্রতিলোম চিরতরে রুদ্ধ হ'য়ে যায়, সৎ-সৃজন বিহিত সবর্ণ ও অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ দেশ তথা দুনিয়াকে দেবলোকে উন্নীত ক'রে তুলতে পারে।

(৭)

আমরা চাই সেই জৈবী-সংস্থিতি-উৎসৃজনী বিবাহ যা মানুষকে ঈশ্বরমুখী অর্থাৎ ধারণ–পালন-সম্বেগ-অভিদীপ্ত ক'রে তোলে। ঐ উদ্দেশ্যই হবে আমাদের সবকিছুর নিয়ন্ত। তার পরিপন্থী যা' তা' আমরা কিছুতেই আমল দেব না–তা' কোন প্রলোভনের বশেও না, ভয়ে কাবু হ'য়েও না। এই-ই আমাদের শাশ্বত, সাত্বত অভিভান।

তুমি হিন্দু হও,
মুসলমান-খ্রীষ্টানই হও
বৌদ্ধই হও,
আর যে-ই হও,-
অন্তঃকরণের স্বতঃ-উৎসারণ! নিয়ে ব'লছি-
কেউই প্রতিলোম-বিবাহ ক'রো না;

স্বামী বা স্ত্রীর মন হয়তো অন্য কোথাও আকৃষ্ট হ'ল। সে তখন পূর্ব্বের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করবার জন্য নানাপ্রকার অজুহাত খোঁজে এবং একটা কিছু ছুতোনাতা ধ'রে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। এমনতর দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এইভাবে সামাজিক জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা যায় বেড়ে, দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের পবিত্রতা ও স্থায়িত্ব যায় ধুলিসাৎ হ'য়ে। পারিবারিক ঐতিহ্য ও কুল সংস্কৃতি লোপ পেয়ে যেতে থাকে। কারণ, 'গৃহিনী গৃহমুচ্যতে'। গৃহে সেই গৃহিনীর স্থিতি যদি পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মত টলটলায়মান হয়, তবে গার্হস্থ্য আশ্রম দাঁড়াবে কার উপর ভর ক'রে? এর ফলে সুপ্রজননের বুনিয়াদ যাবে বিধ্বস্ত হ'য়ে। তার ফলে রাষ্ট্র ও দেশের দশা কী হ'য়ে উঠতে পারে সহজেই অনুমেয়।

সন্তান যদি নিজ পিতার কাছে থাকে, এবং তার পিতা যদি কোন সন্তান স্বামী-পরিত্যাগিনী বা স্বামী-বর্জিতা নারীকে বিবাহ করে, তবে সেই অবস্থাও তার পক্ষে আদৌ সুখকর ও স্বস্তিদায়ক না হয়, সংযত না হয়, শ্রদ্ধাই চরিত্রের অধিকারী না হয়, স্নেহপরায়ণ না হয়, সন্তানের জীবন সেখানে হাহাকারময় হ'য়ে ওঠে। এর ভিতর-দিয়ে তার অন্তরে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়, তাই তার মনোজগতে নিয়ে আসে বিকৃতি ও অসুস্থতা। সেও তার জীবনে অমনতর ছন্নছাড়া রকমেরই পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য হয়। শান্তির নীড় গড়া তার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। অনেক সময় বংশপরম্পরায় ঐ ধারা চলতে থাকে। সাধারণত অমনতর মানুষ শুভসঙ্গতিশীল সুনাগরিক হ'য়ে গ'ড়ে উঠতে পারে না। অন্তর্নিহিত বিক্ষোভের দরুন সে পরিবার-পরিবেশকেও বিক্ষুব্ধ ক'রে চলে।

তুমি স্ত্রীই হও আর পুরুষই হও–
বিবাহের পূর্ব্বে,
অন্ততঃ বাগ্‌দানের পূর্ব্বে
কাউকে স্বামী বা স্ত্রী ভেবে
নিজেকে
তদ্ভাবে ভাবিত ক'রে তুলতে যেও না,
কারণ, কোনক্রমে যদি তোমাদের
বিবাহ নিষ্পন্ন না হয়-
ঐ ভাবানুগ সংহত মনোবৃত্তি
সংঘাত পেয়ে
এমনতর বিক্ষেপ সৃষ্টি ক'রতে পারে-
যা'র ফলে, জীবন অনেকখানিই
বিধ্বস্তিতে বিদলীত হ'য়ে চ'লবে,
যা'রা নিজের স্ত্রী পরিত্যাগ ক'রে
বিবাহ সম্বন্ধ ছিন্ন করে,–
তা'রা নারীদিগকে
বিকেন্দ্রিক ব্যভিচারবিলোল
ক'রতেই এগিয়ে দেয়,
আর, ঐ পরিত্যক্তা নারীদিগকে
যা'রা বিবাহ করে-
প্রত্যক্ষভাবে নিজেরাও
ব্যভিচারদুষ্ট হ'য়ে পড়ে,

(৮)

ঐ বিয়ে দেশ ও সমাজকেও
বিষাক্ত ক'রে তোলে,
তুমি তোমার স্ত্রীকে বর্জন ক'রে
যদি অন্য নারীকে বিবাহ কর,
তা'তে তোমার ব্যভিচারই করা হবে,
কিংবা তা'কে বর্জ্জন না ক'রে
যদি অন্য বিবাহ কর–
অথচ ঐ পূর্ব্ব স্ত্রীর প্রতি
অবৈধ অত্যাচার কর,–
তুমি ক্রুরনীতিদুষ্ট, অপরাধী সেখানেও,
কিন্তু যদি প্রয়োজন হয়–
স্ত্রীকে বর্জ্জন না করে
তা'র সম্মতিক্রমে
অন্য বিবাহ কর'লে
ব্যাভিচারদুষ্ঠু হ'য়ে ওঠবে না,
বা ক্রুরনীতিদুষ্ঠু অপরাধী ব'লেও
পরিগণিত হবে না।

ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় সৈনিক, মহান মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক কালের সাক্ষী, বিমল রায়চৌধুরী

প্রণব দাস

যশোরবাসীর অতি পরিচিত মুখ বিমল রায়চৌধুরী । ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় সৈনিক ও মহান মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক বিমল রায়চৌধুরী কালের সাক্ষী হয়ে দৃপ্ত পদক্ষেপে সমাজ থেকে কুসংস্কার নির্মূল করার জন্য ৮৯ বছর বয়সেও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন ।

সমাজ সংস্কারে আত্মনিবেদিত বিমল রায়চৌধুরী ১৯২৫ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি যশোর জেলার সদর থানার নওয়াপাড়া গ্রামের বিখ্যাত রায়চৌধুরী বংশে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর পিতা সুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী জমিদার এবং একজন সমাজ সংস্কারক ছিলেন । মাতা অনিলা রায়চৌধুরী একজন প্রগতিশীল মহিলা, যিনি গ্রামের মহিলাদের উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে সূচীশিল্পের প্রশিক্ষণ দিতেন । আদর্শ বাবা-মায়ের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েই সমাজ সেবার কাজ করেন বলে তিনি জানান ।

বিমল রায়চৌধুরী যশোর জিলা স্কুলের ছাত্র ছিলেন । তিনি জানান, জিলা স্কুলে পড়াকালীন সময়ে ১১ বছর বয়সেই ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত হন । ১৯৩৬ সালে জিলা স্কুলে পড়াকালীন ছাত্র ফেডারেশনে যোগদান করেন তিনি । ১৯৪২ সালে প্রথম বিভাগ পেয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেন ।

পাশ করার পর তিনি ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে কলকাতায় ক্যাম্বেল হাসপাতালে (নীল রতন সরকার মেডিকেল এ্যান্ড হাসপাতাল) এল. এম. এফ কোর্সে ভর্তি হন । ঐ বছর ৯ই আগস্ট মেদিনীপুর রেভলিউশন শুরু হলে রাজনৈতিক সচেতনতার কারণে ১২ আগস্ট তিনি বন্ধু-বান্ধবসহ ৭ জন মেদিনীপুর গমণ করেন । ১৭ই আগস্ট মেদিনীপুর থেকে ফেরার পথে গ্রেফতার হন । মাস খানেক পরে তদন্ত করে তাঁকে মুক্তি দেয়া হয় । কিন্তু তাঁকে আর মেডিকেল কলেজে পড়তে দেয়া হলো না । বাধ্য হয়ে ১৯৪৩ সালে যশোর সরকারী এমএম কলেজে ভর্তি হন । এ সময় তিনি মৎস্যজীবী ও কৃষক সমিতির সাথে যুক্ত হন এবং ১৯৪৫ সালে জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন । ১৯৪৫ সালেই তিনি আইএসসি পাশ করেন । এ কলেজ থেকেই ১৯৪৮ সালে বিএ পাশ করেন । প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও নানা পারিপার্শ্বিক কারণে এমএ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেননি তিনি ।

১৯৪৮ সালে বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চাকরি অথবা ব্যবসার দিকে না ঝুঁকে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন । ১৯৪৯ সালে তে-ভাগা আন্দোলনে বাঘারপাড়া ও নড়াইলের নমঃশূদ্র অধ্যুষিত এগারখান অঞ্চলের দায়িত্ব পালন করেন । এ আন্দোলনে জড়িত থাকার অপরাধে তিনি গ্রেফতার হন এবং এক মাস পর মুক্ত হন । তিনি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন । ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন । ভাষা আন্দোলনে জড়িত থাকার অপরাধে গ্রেফতার হন এবং ১৫ দিন পরে মুক্তি পান । এবছরই তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন । কেশবপুর মঙ্গলকোট গ্রামের বিমলকৃষ্ণ ঘোষের কন্যা শিলা রায় ঘোষকে বিবাহ করেন । বিয়ের পরও তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন । ১৯৫৪ সালের ৩০শে মে আবার তিনি ৫৪ ধারায় গ্রেফতার হন এবং প্রায় দেড় বছর কারাভোগ করার পর ১৯৫৬ সালে মুক্তি পান । কারাগারে আন্দোলন করার অপরাধে যশোর কারাগারে দু'মাস, রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে তিন মাস ও কুমিল্লা কারাগারে দু'মাস রাজবন্দী হিসেবে কারাযাপন করেন এবং বাকী সময় তিনি ঢাকা ও বহরমপুর কারাগারে বন্দী থাকেন । ১৯৫৬ সালের সিকিউরিটি এ্যাক্ট এর আওতায় তাঁকে আবার গ্রেফতার করা হয় এবং দুই মাস পরে মুক্তি দেয়া হয় । ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত গোপনে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে জড়িত থাকেন । ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় তিনি আবারও গ্রেফতার হন এবং কিছুদিন পর মুক্তি লাভ করেন ।

১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের তে-ভাগা আন্দোলন মেনে নিয়ে সমাজতান্ত্রীক সরকার কায়েমের শর্তে আওয়ামী

লীগের প্রার্থীর পক্ষে প্রচারাভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি সংগঠক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মার্চ মাসে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের বিনামূল্যে বোমা সরঞ্জাম সরবরাহ করেন। ২৮শে মার্চ পুলিশ লাইন থেকে বাঙালি পুলিশ বের হয়ে আসে। ২৯শে মার্চ যশোর জেলখানা আক্রমণ ও জেলাবন্দীদের মুক্তিতে সহায়তা করেন তিনি। ঐ দিন রাতে ইপিআর, পুলিশ ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের আর্মিদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ৩১শে মার্চ পাক আর্মিরা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আশ্রয় দেয়ার অভিযোগে নওয়াপাড়া চৌধুরী বাড়ী আক্রমণ করে। ৮ই এপ্রিল কেশবপুর, সাতক্ষীরায় অবস্থান করেন এবং ১৮ই এপ্রিল ভারতে প্রবেশ করেন এবং বনগাঁ ক্যাম্পে ৪টি মুক্তিযুদ্ধের শিবিরের দায়িত্ব পালন করেন। ১৮ই আগস্ট তিনি পলিটিক্যাল লিয়াঁজো হিসেবে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি গোহাটি ও সিলং থেকে মুক্তিযুদ্ধের পলিটিক্যাল ট্রেনিং গ্রহণ করেন। ৬ ডিসেম্বর যশোর মুক্ত হওয়ার পর ৭ই ডিসেম্বর যশোর ফিরে আসেন তিনি। ১৯৭৪ সালে বাকশাল রাজনীতির সাথে জড়িত হন। বেশ কয়েকবার কারাবাস সত্ত্বেও তিনি রাজনৈতিক অঙ্গন ত্যাগ করেননি। ৭১ পরবর্তী সময় তিনি আওয়ামী লীগের সঙ্গে জড়িত থাকেন। বর্তমানে তিনি জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সিনিয়র সদস্য।

বিমল রায়চৌধুরী ১৯৬৪ সালে বি. ডি সিস্টেমে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত সদস্য হন এবং ঐ বছরই নওয়াপাড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। একটানা ১৯৮৮ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ে তিনি যশোর বোর্ড ও যশোর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর সময়ে ১৩ হতে ৫৪টি মসজিদ ও ৩ থেকে ৮টি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বাহাদুরপুর হাইস্কুল, নবনাগরী গার্লস স্কুল, তালবাড়িয়া হাইস্কুল, ঘুরিলিয়া হাইস্কুল, পাঁচবাড়িয়া গার্লস স্কুল ও মোমিননগর হাইস্কুল প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে সমাজসেবামূলক অসংখ্য সংগঠনের সাথে জড়িত থাকেন। তিনি জে. ডি. এস-এর জীবন সদস্য ও তিন বার ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, এভারগ্রীণ ক্লাব ও এম. এস ক্লাবের সেক্রেটারী দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ফুটবল, ক্রিকেট, বাসকেট বল, ভলিবল, তাস, কাবাডি ও কেরাম খেলার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেন। তিনি হিমাইতপুর পাবনার শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গের সভাপতি, ওয়ার্ল্ড হিন্দু ফেডারেশন (কাঠমুন্ডু, নেপাল) এর সদস্য, হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের (ঢাকা) প্রেসিডিয়াম সদস্য, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ (ঢাকা) এর সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিরামপুর নওয়াপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মসজিদ মহল্লা প্রাথমিক বিদ্যালয় যশোর এর সভাপতি এবং শিলা রায়চৌধুরী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সদস্য এবং যশোর বিআরটিএ এর সদস্য। তিনি যশোরের নাট্য আন্দোলনের অন্যতম অভিনেতা ও সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি যশোর ইন্সটিটিউট পাবলিক লাইব্রেরীর বিভিন্ন বিভাগের সম্পাদক থেকে সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি যশোর ইন্সটিটিউটের (১৯৫২-১৯৯৮) আজীবন সদস্য। তিনি ১৯৫২-১৯৫৮ সাল পর্যন্ত নাট্যকলা সংসদের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি যশোর চেম্বার অব কমার্সের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। শিল্পকলা একাডেমীর সাথেও সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি অসংখ্য শিক্ষালয়সহ হিন্দু-মুসলিম ও বিভিন্ন জাতির ধর্ম উপসনালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি সংস্কৃতি সেবক এবং কুসংস্কার বিরোধী। তাঁর মত এ ধরণের সমাজসেবক ও দেশ দরদী ব্যক্তি সত্যিই বিরল।

বিমল রায়চৌধুরী পারিবারিক জীবনে এক পুত্র ও তিন কন্যা সন্তানের জনক। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চৌধুরী এন্ড কোম্পানীর মালিক ডাক্তার যামিনীকান্ত রায়চৌধুরী বি. এস. সি.এম. ডি ১৯৪৬ সালে সংসার ত্যাগ করে পরমপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহযাত্রী হয়ে বিহার গমণ এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সেখানে বসবাস করেন।

এরকম একজন বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী বিমল রায়চৌধুরী সমাজে খুবই প্রয়োজনীয় আজ। তাই তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করছি তিনি যেন আরও অধিক সময় সমাজের কল্যাণে নিজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথিত শব্দের ব্যাখ্যা

বাগার্থ-দীপিকা থেকে সংকলিত ধারাবাহিক

(পূর্ব প্রকাশের পর)

শিষ্টদীপী [অনুশ্রুতি ৭ম, অনুরাগ, ১৭]-শিষ্ট ভাবকে দীপ্ত করে তোলে যা ।

শিষ্ট-দ্যোতন [ধৃতি-বিধায়না, ১ম, ৩৯৫]-শিষ্টভাবকে বিকশিত করে তোলে যা' । দ্রষ্টব্য 'দ্যোতন' ।

শিষ্ট-সম্বোধি [সমাজ-সন্দীপনা, ১৫৭]-শিষ্ট এবং সমীচীন বোধ-যুক্ত । দ্রষ্টব্য 'সম্বোধি' । -"বাপ যেখানে মা'র সদৃশ নয়, শিষ্ট সম্বোধি নয়কো ।"

শিষ্ট-সৃজী [সম্বিতী ৩য়, বর্ণাশ্রম, ৮৩]-বৈধ, সুন্দর ও মঙ্গল যা'-কিছুর সৃষ্টিকারী ।

শিষ্য [সত্যানুসরণ]-শাসনের যোগ্য, (গুরুর উপদেশ-অনুযায়ী) অনুশাসিত হয়ে উঠেছে যে । শাস+ক্যপ(কর্ম্মবাচ্যে)]

শীর্ষ-দীপালী [আশিসবাণী ২য়, ১০১]-শ্রৈষ্ঠ দীপ্তির সৃষ্টি হয় যার দ্বারা ।

শীল [যতি-অভিধর্ম্ম, ১৩]-সত্তাপোষণী চলন । [শীল (সমাধি, সেবা, অনুভাবন)+অল(করণে)]

শীলচলন[যাজীসূক্ত, ২৬]-শিষ্ট আচরণ ও চলন ।- "অনুশীলনী শীল -চলনে চলে---সুযোগ্য হয়ে ওঠ ।"

শীলতা [বিধান-বিনায়ক, ৩০৮]-সাধু আচরণ ও অভ্যাস । [শীল+তল্ (ভাবে)]

শীলধর্ম্মী [আশিষ্বাণী ১ম, ৫৮]- সৎ আচরণ ও অভ্যাসই চরিত্রের স্বভাবধর্ম্ম যেখানে ।

শীলন-তৎপরতা [আচারচর্য্যা ১ম, ৫০১]-অনুশীলন ও সদভ্যাসের তৎপরতা । [শীল্ (সমাধি, সেবা, অনুভাবন)+অনট্+শীলন]

শীলন-বিন্যাস [ধৃতিবিধায়না ১ম, ৬৪]-অনুশীলন ও অভ্যাসের মধ্য দিয়ে গঠিত বিন্যাস ।

শীলন-লাস্য [বিজ্ঞান-বিভূতি, ৫৫]-অনুশীলনের ভিতর দিয়ে হয়ে ওঠার ছন্দায়িত গতি । দ্রষ্টব্য 'লাস্য' ।

শীলন-শালিনী সঙ্গতি [শিক্ষাবিধায়না, ২০৫]-অভ্যাস ও অনুশীলন-সমন্বিত সঙ্গতি ।

শীলন-শাসন [শিক্ষা-বিধায়না, ২০৫]-অভ্যাস ও ধারণার অনুশাসন ।

শীলন-সন্দীপী[তপোবিধায়না ১ম, ১২৯]-অভ্যাস ও অনুশীলনের জাগরণ ঘটায় যা' ।

শীলন-সম্বেগী [বিবাহ-বিধায়না, ৫৭]-উন্নত আচরণ ও চলনের আবেগ-সম্পন্ন । -"শ্রেয়শ্চরণী আবেগ যত বিশুদ্ধ, উৎকর্ষী শীলন-সম্বেগী" ।

শীলন-সৌষ্ঠব [দর্শন-বিধায়না, ৬৯]-অনুশীলন ও অভ্যাসের সুষ্ঠুতা ।

শীল-সঙ্গতি [আশিসবাণী ১ম, ৩৯]-অভ্যাস ও চালচলনের সঙ্গতি ।

শীলসঞ্চয়ী [আশিসবাণী ১ম, ৩৯]-সদভ্যাসকে আয়ত্ত করে যা' ।

শীলসন্দীপ্ত [বিকৃতি-বিনায়না, ৩৫৪]-সাধু আচরণ ও অভ্যাসে ফুটন্ত (পুষ্ট) ।

শীলসম্বুদ্ধ [কৃতিবিধায়না, ৩৬৮]-সদভ্যাসের ভিতর দিয়ে সম্যক বোধে উপনীত । দ্রষ্টব্য 'সম্বুদ্ধ' ।

শীলসম্বেগ[নিষ্ঠাবিধায়না, ৮৯]-অনুশীলন ও সেবার আকূতি ।-তদ্যুক্ত 'শীলসম্বেগী' [অনুশ্রুতি ৫ম, বিশ্বরূপ, ৬]

শুদ্ধসত্ত্ব [অনুশ্রুতি ৩য়, বিবাহ, ২১]-শুদ্ধ (পবিত্র) সত্ত্ব (জীবন) যার ।

শুভকম্পিতা [কৃতিবিধায়না, ২৩৫]-শুভ সম্বেগের অনুরণন ।- "অন্তরে কোন শুভকম্পিতা এলেই ।"

শুভকর্ম্মিতা [সদবিধায়না ২য়, ৫৪]-মঙ্গল করার আকুলতা । -"শুভকর্ম্মিতা হতে সে এক পাও টলেনি ।"

শুভক্রমণা [সমাজ-সন্দীপনা, ৩৫৭]-মঙ্গলকর চলন । দ্রষ্টব্য 'ক্রমণা' ।

শুভক্রিয় [বিবিধসূক্ত, নীতি, ২২]-শুভকর্ম্মশীল । [শুভ-কৃ (করা)+য]

শুভচয়নী [কৃতিবিধায়না, ২৫৬]-শুভকে আহরণ করে যা' । [শুভ-চি(চয়ন)+অনট্+ঈপ]

শুভচারিতা [সমাজ-সন্দীপনা, ৩৫৭]-মঙ্গল-আচারণশীলতা ।

শুভ-জৃম্ভণী [চর্য্যাসুক্ত, ২৩]-শুভকে বিকশিত করে তোরে যা । দ্রষ্টব্য জৃম্ভণী' ।

শুভতর্পিতা [সদবিধায়না ২য়, ৫৩]-মঙ্গলজনক ভাবে তৃপ্ত করে চলা । -"বন্ধুত্ব-বন্ধন যত –দৃঢ় হয় শুভতর্পিতা নিয়ে ।"

শুভদর্শী [বিধিবিন্যাস, ২৯৫] -মঙ্গল দেখে চলে যে । [শুভ-দৃশ্ দেখা)+ণিন্ (কর্ত্তরি)]

শুভদীপী[ধৃতিবিধায়না ১ম, ৪০১]-মঙ্গলকে দীপ্ত করে তোলে যা । [শুভ-দীপ (দীপ্তি)+ইন]

শুভ-বিনায়নী [বিকৃতি-বিনায়না, উদ্বোধনী বাণী]-শুভ'র পথে বিনায়িত (নিয়ন্ত্রিত) করে যা' । দ্রষ্টব্য 'বিনায়নী' ।

শুভ-বোধায়নী [সদ্বিধায়না ১ম, ৭৫]-শুভ বোধের পথে নিয়ে চলে যা ।' দ্রষ্টব্য 'বোধায়নী' ।

শুভশালিনী [বিবিধসূক্ত, নীতি, ৬৮]-শুভের পথে নিয়ে যায় যা' । [শালিনী, শল্=গতি, অথবা, শাল=প্রশংসা} । -"শুভশালিনী অনুনয়নায় যা' বলবার বলো ।"

শুভশ্রী [ধৃতিবিধায়না ১ম, ৪০১]-যে শোভা বা সৌন্দর্য্য সাত্বত কল্যাণকে বহন ও ধারণ করে ।

শুভ-সঙ্কল্পী [সদবিধায়না ১ম, ১৪৩]-শুভ সঙ্কল্প যার আছে । [শুভ-সঙ্কল্প+ইনন্তদযুক্ত অর্থে)]

শুভ-সন্ধিক্ষু [কৃতিবিধায়না, ৩৫১]-শুভকে যা সন্দীপ্ত করে তোলে । দ্রষ্টব্য 'সন্ধিক্ষু' ।

শুভ-সমীক্ষ [নীতি-বিধায়না, ৩৪১]-শুভকে যা' সম্যকপ্রকারে দেখে চলে । [সম-ঈক্ষ(দর্শন)+অচ্+সমীক্ষ-সম্যক্ দর্শন আছে যার]

শুভসিঞ্চনী [যাজীসূক্ত, ১৩৫]-মঙ্গল সেচন করে যা' [সিঞ্চনী, সিচ সেচন]

শুভানী [আশিসবাণী ১ম, ৫৬]-মঙ্গলদায়িনী, কল্যাণী । [বিশেষ প্রয়োগ][শুভ-শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ রূপ] ।-"তাই, মা শিবানী, শুভানী ।"

শুদ্র [অনুশ্রুতি ৬ষ্ঠ, বর্ণাশ্রম, ১৩]-শুচীকৃত (আর্য্যীকৃত) অনার্য্য । [শুচ্ (পবিত্র করা) + রক্ (কত্তরি)]

শেল-সন্তাপী [সদবিধায়না ১ম, ১২৭]-আঘাতজনিত দুঃখ -যুক্ত ।[সন্তাপ আছে যাতে, এই অর্থে সন্তাপ+ইন্]-"শেল-সন্তাপী হয়েও তোমাতে অনুরাগ-উদ্দীপী হয় যেন ।"

শোধন-সন্দীপনা [চর্য্যাসূক্ত, ১৩৬]-পরিশুদ্ধ করার সমীচীন দীপ্তি বা আগ্রহ । দ্রষ্টব্য 'সন্দীপনা' ।

শোষণ-স্রক্ষণা [নীতি-বিধায়না, ২৯১]-শোষণরূপ তেলের দ্বারা লিপ্ত করা, অর্থাৎ উত্তমরূপে শোষণ করা । দ্রষ্টব্য 'স্রক্ষণা' ।-উদ্যম-অনুপ্রেরণাকে শোষণ-স্রক্ষণায় যদি অবসন্ন করে তোল ।"

শোষণা-সংক্ষোভী [আচারচর্য্যা ১ম, ৫৩৭]-শোষণজনিত সংক্ষোভ অর্থাৎ উদ্বেগ বা পীড়ন-সৃষ্টিকারী । [সংক্ষোভী=সম্-ক্ষুভ্এক্ষাভ, উদ্বেগ, বিকার)+ণিন]

শৌর্য্য [আশিসবাণী ২য়, ৭৭]-(১) (সৃজন-সম্বেগ), (২) শক্তি বা সম্বেগের ক্রিয়া । শৌর্য্য=সৌর্য্য, শুর সুর থেকে উৎপন্ন । দ্রষ্টব্য মনিয়র উইলিয়মস -কৃত সংস্কৃত অভিধান । সুর (৩নং) আবার সূ(=প্রসব) থেকে জাত । সু (প্রসব)+রক্ (কর্ত্তরি)=সুর (সুর্য্য)-প্রসবিতা, সুর+ষ্যণ্ (ভাববাচ্যে)=সৌর্য্য-শৌর্য্য] । দ্রষ্টব্য 'সৌর্য্য' ।

সৎসঙ্গের নিজস্ব ওয়েব সাইট ভিজিট করুন
www.srisrithakuranukulchandrasatsang.com

চিরঞ্জীব বনৌষধি

(১ম খণ্ড)

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য্য

জল-জমানী (ছিলি হিন্ট)

গ্রামীণ জীবনের শৈশবে খেলাপাতির একটা স্বতন্ত্র ঘর-সংসার পাতা হ'তো । সে ঘরে বন-ভোজনের উৎসব পর্বও হ'তো; আবার পুতুলের বিয়ের নিমন্ত্রণ এবং তার আয়োজনও হ'তো সেই ঘরে, সঙ্গে থাকতো ভূরিভোজন ।

এই ভোজনের প্রধান উপাদান ও উপকরণ থাকতো খোলাম-কুচি ও চিতে পাতার লুচি, আর তরকারীর খোসার ব্যঞ্জন এবং দই; সেই দই বস্তুটি প্রস্তুত করা হ'তো দই-এ খই-এ' পাতার রসে অল্প জল মিশিয়ে; খাওয়ার সময় মুখে টক্ টক্ শব্দ ক'রে দই আস্বাদনের তৃপ্তির ধ্বনিও তোলা হ'তো ।

এ স্মৃতি অনেকেরই মন থেকে আজও হয়তো স'রে যায়নি; এখন দেখছি, নাঃ, সে দই-এ খই-এ পাতার প্রয়োজন সে বয়সেই ফুরিয়ে যায়নি; তবে তার ধারা ব'দলেছে; ঠিক যেমন বাল্যের কর, খল, ঘট-এর অভ্যাস, সেই অভ্যাস পরে হয় সেইসব শব্দের ব্যাকরণের পদচ্ছেদ চিন্তা, আর তার অর্থবোধের বিশেষ প্রয়াসে ।

তাই ব'লছিলাম, বাল্যের সেই খেলাঘরের দই-পাতা এখন ভৈষজ্যবিজ্ঞানের রস-বিচারে দাঁড়িয়েছে । আমার বক্তব্যের বিষয়বস্তু সেই দই-জমানো লতাটি ।

বহুপ্রাচীনকালেই ছিল এই ভারতে বনৌষধির সার্থক (অর্থযুক্ত) নামকরণ করার রীতি । ওতেই থাকতো দ্রব্য পরিচিতির অন্যতম দিগ্‌দর্শন; কিন্তু আলোচ্য বনৌষধি দ্রব্যটির সন্ধান যদিও তেমনভাবে বৈদিক সংস্কৃতিতে সার্থকনামা ক'রে নমুনা পাওয়া যায়নি এবং সংহিতার যুগেও দেখছি সে অনুপস্থিত; তাই কতক অনুমানের ভরসায় বৈদিক ভৈষজ্যনামের মধ্যে সেটি হয়তো লুকিয়ে থাকলেও থাকতে পারে, যা আজও আমরা খুঁজে পাচ্ছি না, কারণ বৈদিক শব্দাভিধানকার যাস্ক ব'লেছেন–শব্দশক্তি ৩ প্রকার–(১) প্রত্যক্ষ, (২) পরোক্ষ, (৩) আজীবক, অর্থাৎ আজীবক হ'লে আমরা যেটাকে বলি প্রমুখাৎ (মুখে মুখে) । এই লতাটির নামই বা তেমনি সেই আজীবক পর্যায়েই থাকতে পারে তার শব্দনাম; যেহেতু এই লতাগাছটি বৈদিক সংহিতা রচনার সময় তার কোন মৌলিক শব্দ বা সমার্থক শব্দেরও সমাবেশ করা হ'য়েছিলো কিনা দেখা যায় না ।

ওষধির পঙ্‌ক্তি-ভুক্তি করণঃ– ষোড়শ শতকের আয়ুর্বেদিক গ্রন্থ ভাবপ্রকাশে দেখা যায়, তৎকালের পরিচয়ে তার দেশীয় নাম 'ছিলিহিন্ট' । এইটিই এখন সর্বভারতীয় বৈদ্যক সমাজের পরিচিত নাম । বাংলায় ছিলিহিন্টের চলতি নাম দই-এ খই-এ বা হয়ের । কোন কোন অঞ্চলে দদৈয়া পাতা (মেদিনীপুর) বলে । এটি হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলে বসন বেল', ছিরেটা, পাতালা গরুড়ী, ফরিদ বুটি, জল-জমানী ইত্যাদি নামে পরিচিত; এভিন্ন প্রদেশান্তরে তার আরও নাম আছে; তবে বোটানিক্যাল নাম Cocculus hirsutus (Linn.) Diels. এবং Menispermaceae ফ্যামিলীভুক্ত । সমগ্র ভারতবর্ষে এর ২০টি প্রজাতি আছে; এভিন্ন সিংহল, পেগু, দক্ষিণ চীন ও আফ্রিকার উষ্ণপ্রধান অঞ্চলে এই জংলা লতাগাছটির সন্ধান মেলে । এগুলি প্রধানতঃ জন্মে উষ্ণপ্রধান অথবা নাতি-শীতোষ্ণ অঞ্চলে । ভারতের গ্রামে গেলে একে চিনতে কষ্ট হয় না, ঠাকুমা থেকে নাতনী পর্যন্ত সকলেই এর সঙ্গে পরিচিত । আর আপনিও পরীক্ষা ক'রে চিনতে পারবেন; এর ৩/৪টি পাতা অল্প জলে রগড়ালে কয়েক মিনিটের মধ্যেই জলটি জমে দই-এর আকার নেয় ।

গ্রন্থোক্ত পরিচিতি ও প্রকৃতি পরিচয়

আয়ুর্বেদিক গ্রন্থের (ভাবপ্রকাশ) শ্লোকটি এখানে উদ্ধৃত করছি–

ছিলিহিন্টঃ মহামূলঃ পাতালগরুড়াহ্বয়ঃ ।
ছিলিহিন্টঃ পরং বৃষ্যঃ দাহঘ্নঃ পবনাপহঃ॥

এই শ্লোকটর দুটি দিক আছে–একটি হচ্ছে তার নাম আর অন্যটি হ'চ্ছে তার ভৈষজ্য শক্তি । নামগুলিতে রয়েছে মহামূল ও পাতালগরুড় দুটি সংজ্ঞা । এটি প্রধানভাবে বৃষ্যগুণ সম্পন্ন (Refuvenative) এবং সে কফ ও বায়ুকে প্রশমিত করে ।

রোগ প্রতিকারে

(১) এর প্রধান কাজ urinary system-এর উপর–প্রস্রাবের সময়, যেকোন কারণেই হোক, যদি জ্বালা ও জ্বালাবোধ হয়, সেক্ষেত্রে। ৩/৪ গ্রাম কাঁচা পাতাকে থে'তো ক'রে আন্দাজ আধ পোয়া জলে সেটাকে চটকে ছে'কে অল্প চিনি দিয়ে সকালে বা বিকালে খেলে জ্বালা-যন্ত্রণা থাকে না; এটা গণোরিয়াকেও উপশমিত করে। নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা চলে।

(২) প্রস্রাবের পূর্বে বা পরে কিছু ক্ষরিত হতে থাকলে (লালামেহ বা শুক্রমেহ রোগে–Spermatoorhoea) এর পাতা উপরিউক্ত নিয়মে সরবৎ ক'রে ব্যবহার করলে অপূর্ব কাজ পাওয়া যায়। তবে ব্যবহারবিধি সহজ করতে গেলে এটাকে শুকিয়ে গুড়ো ক'রে ৬ বা ৮ গ্রেণ (৩/৪ রতি) মাত্রায় সকালে বা বৈকালে সুবিধে মত সময়ে একবার দুধ বা জল দিয়ে খেতে হয়; এটাতে দাস্তও ভাল পরিষ্কার হয়।

(৩) স্বপ্নদোষে– এই পাতার সরবৎ বা গুড়োর সঙ্গে ৪/৫ গ্রেণ কাবাবচিনির গুড়ো বা ২/১ দানা কর্পূর মিশিয়ে দুধের সঙ্গে খেলে এটার হাত থেকে একেবারে পরিত্রাণ পাওয়া না গেলেও সীমিত থাকে। এটা বৃদ্ধ বৈদ্যের অভিজ্ঞতা।

(৪) শূক্র তারল্যে এবং ক্ষীণতায়ঃ– পূর্বোক্ত নিয়মে একটু বেশীদিন খেতে হয়।

(৫) রক্ত দূষ্টিতেঃ– সালসার (Sarsaparilla) ন্যায় কাজ করে। এই গাছের মূল এবং অন্যান্য রক্ত-পরিষ্কারক ওষধির সঙ্গে গ্রহণ ক'রে থাকেন অন্যান্য প্রদেশের চিকিৎসকগণ। এ-ভিন্ন পুরাতন বাত রোগের ক্ষেত্রেও এই মূলের উপযোগিতা আছে।

(৬) শূষ্ক একজিমায় (Dry Eczema) বাহ্য প্রয়োগ (External uses):– যে একজিমায় রস গড়ায় না, অথচ চুলকায়, সেক্ষেত্রে এটাকে জলে রগড়ে ঘন দই-এর মত ক'রে লাগিয়ে থাকেন কোন কোন প্রদেশের সাধারণ লোক।

(৭) চোখের পার্শ্ব ক্ষতেঃ– এই পাতার দই-এর ফোঁটা দিলে আরাম হয়।

(৮) চুলকণায়ঃ– এটা শিশুদের হলে এই পাতার দই গায়ে লাগালে চুলকণা কমে যায়, তবে দুপুরের দিকে (স্নানের পূর্বে) লাগানো ভাল, নইলে দুর্বল শরীরে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।

(৯) বিষ–ফোড়ায়ঃ– জ্বালা বা প্রদাহে এই পাতা বেটে ফোড়ার উপর প্রলেপ দিলে জ্বালা ও প্রদাহ দুয়েরই উপশম হয়; আবার কোন কোন অঞ্চলে আগুনে পোড়ায় এটার দই লাগিয়ে থাকেন সাময়িক জ্বালা নিবৃত্তির জন্য, কারণ ও ক্ষেত্রে শৈত্য প্রয়োগ যেমনি নিষিদ্ধ তেমনি উষ্ণবীর্য, শীতবিপাক স্নেহ ভিন্ন অন্য কিছু প্রয়োগও ঠিক নয়।

(১০) জিহ্বা ক্ষতেঃ– এই গাছের মূলটা ঘষে অথবা মূল বেটে ঘিয়ের সঙ্গে পাক ক'রে জিভে লাগালে ক্ষত সেরে যায়। এটা ব্যবহার করতেন কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ট বৃদ্ধ বৈদ্যগণ। অবশ্য এইসব লৌকিক ব্যবহারের কয়েকটির সংগ্রহকার ১৯ শতকে ভারতে আগত পাশ্চাত্য গবেষকবৃন্দ।

(১১) **নব্য বৈজ্ঞানিকের সমীক্ষঃ–** বিংশ শতকে এই লতাগাছটির ভৈষজ্যগুণ সম্পর্কে তাঁরা লিখলেন– Sedative, Hypotensive, Bradycardiac cardio tonic and Spasmolytic. এই ভেষজটিতে হয়তো এরকম বহু উপযোগিতা এখানো আমাদের অজানা র'য়ে গিয়েছে; কারণ কোন শব্দের অলক্ষ্য স্পর্শে বৃক্ষের পাতার নৃত্য এবং পাতার রস বহির্বায়ুর সংস্পর্শে এলে ঘন হ'য়ে যাওয়ার মৌলিক কারণ কি (যদিও প্রত্যক্ষ)–এসব তথ্যের পাঠ অদ্যাবধি আমরা আমাদের আয়ুর্বেদের সংগ্রহ গ্রন্থে এমন কি হাতের লেখা কোনও ঘরোয়া পুঁথিপত্রের আলোচনার সূত্রে পাই নাই। যা পাই শিশুদের খেলাঘরের একটি উপাদান নিয়েই। ভাবতেই পারি না প্রকৃতির খেলাঘরে এই রকম শত সহস্র উপাদান পড়ে রয়েছে–যা আজও আমাদের কাছে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত এবং অনাদৃত। তাদের দিকে দৃষ্টি দিয়েই তো একদিন এই ভারতের ঋষিগণ জনকল্যাণে তাদিগকে চিহ্নিত করেছেন এবং ব্যবহার করার রীতিও জানিয়েছেন।

এ দেশের অধিকাংশ মানুষ অল্পবিত্ত সমাজের, তাঁরা অধিক ব্যয়ে চিকিৎসা করাতে অসমর্থ, কিন্তু ভারতের প্রতিটি বন সম্পদকে যদি চিকিৎসার উপযোগী ক'রে নেওয়া যায়, তাতে সব লতাপাতার মধ্যেই যে বিশেষ ভৈষজ্যশক্তি নিহিত রয়েছে তেমন পরিচয়ের সঙ্গে আমাদের শরীর ও মনের অনেক ব্যাধিরই সুষ্ঠু চিকিৎসা করা যাবে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের স্বীকৃতিটা পূর্বে না রেখে ওকে পরবর্তীকালের সমর্থক ব'লেই গণ্য করা হোক না–সেই রীতিই আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন।

গান / কবিতা

"ভাটিয়ালী"
ডাঃ ভুপেন্দ্রনাথ মণ্ডল

তোমার দেশে যাব আমি নামের বাদাম দিয়া
ঝড় তুফানে দিলাম পাড়ি দেখ তুমি চাহিয়া ॥
সংসার চক্রে ঘুরছি আমি,
ভুলের ক্ষমা করো তুমি,
তোমার পানে চাইয়া জীবন তার দিলাম বহিয়া
তোমার দেশে যাব আমি নামের বাদাম দিয়া ।
ইষ্টানুরাগ বক্ষে লয়ে
মান অভিমান ত্যাগ করিয়ে
পরশ মনির পরশ রতন জড়াব ধরিয়ে
(তোমার .....)
কণ্ঠ ভরে গাইব গান
জেগে উঠবে মানবের প্রাণ ॥
পুরুষোত্তমের ধ্বনিতে এবার ধরণী উঠবে কাঁপিয়ে ॥
তোমার দেশে যাব আমি নামের বাদাম দিয়া ।
ম্লেচ্ছাচারে দেশ ছেয়েছে
সত্যবাণী ভুলে গিয়েছে,
মানব রূপি ভগবানকে সাথী করো নিয়া
তোমার দেশে যাব আমি নামের বাদাম দিয়া ॥

পশুরা উত্তম
তপনকুমার সুকুল

পশু-পাখিরা ভালো আমাদের চেয়ে
অরণ্য আঁধারে থাকে আরামে আয়েসে ।
কীট-পতঙ্গের সাথে থাকে মিলে মিশে ।
অবুঝ সবুজ জানি ওদের হৃদয় ॥
নিরাপত্তা খোঁজে তারা আপন বলয়
বাঁচিবার প্রয়োজনে হিংস্র হয় ।
ওদের হৃদয়ে প্রেম আছে ভরপুর–
তাদের ভাষায় আছে মিষ্টি কণ্ঠ সুর ॥
জগতের সেরা-ব্রতে তাহাদের আছে অবদান
হাড়-মাংস দুগ্ধ দিয়ে যোগায় আহার ।
নির্দয় মানব তারে করে সে শাসন
মাঝে মাঝে যত্ন করে স্বার্থের কারণ ॥
মনের সমাজ আজ বিভাজনে বহুধা বিভক্ত
সাম্রাজ্য গাড়ীতে যেয়ে দেশে দেশে ঝরাতেছে রক্ত ।
শাসকে শোষিতে আজ হয় পরিণত–
মানুষ মানুষ আজ পরায় শৃঙ্খল ॥

তবুও ও অশেষ প্রেম
তপনকুমার সুকুল

কলেবরে আজ আর তেজ নেই শায়িত শয়ানে
নিথর নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে আছি ধরণীর কোলে ।
শোণিতের স্রোতধারা ক্ষীণ আজ দেহের ভেতরে
থেমে যেতে পারে যে কোন সময় কিছু নাহি বলে ॥
মনে হয় অলৌকিক বেঁচে আছি সুন্দর ভূবনে
এখনো পরান পাখি ডানা মেলে চঞ্চল বাতাসে ।
সারাবেলা মুখরিত করে রাখে প্রশান্ত আকাশে ॥
জীবনের দেহখড়ি অচল স্থবির হয়ে যাবে
বিষয়ের কারাগারে রোগ ভোগে থাকিবোনা আর ।
পলকের প্রেমে পড়ে মনখানি কি জানি কি ভাবে
এখানে অমৃত আছে বেদনায় তীব্র যন্ত্রণার ॥
অকাল বার্ধক্য নিয়ে অপারগ মেধা আর প্রেমে
তবুও অশেষ প্রেম আজো আছে হৃদয় গভীরে ।
অশান্ত বাসনা রাশি নেচে ওঠে পুলকে চরমে
উদ্বেলিত ঢেউ গুলি ফনা তোলে জলাধর নীড়ে ॥
মৃত হয়ে লাশ হয়ে ভেসে যাই তোমার প্রদেশে
সেখানেও কি যে শান্তি সব জানে কঠিন প্রস্তরে ।
পাহাড়ের প্রস্রবণ তৃপ্তি পায় সমতলে এসে
অতঃপর মোহনায় মিশে যাবো সলিল অন্তরে ॥
হয়তো লুকিয়ে রবো কাঁশফুলে আমি দুলে দুলে
কোন এক ভিন্‌দেশে না জানা নদীর কুলে কুলে ॥

সৎসঙ্গ সমাচার

সাতক্ষীরা

শ্যামনগর উপজেলা সৎসঙ্গ মন্দিরে দ্বিমাসিক প্রতিবেদন

গত ২রা আশ্বিন ১ মে ২০১৪ খ্রী. শুভ শুক্রবার শ্যামনগর উপজেলা সৎসঙ্গ মন্দিরে এক সাপ্তাহিক সৎসঙ্গ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সমবেত প্রার্থনা, সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠ ও আলোচনা করা হয়। দুপুর ২ টায় বাদঘাটানিবাসী অসিম মন্ডলের গৃহে সৎসঙ্গ ভক্তসেবার আয়োজন করা হয়।

* গত ৯ই আশ্বিন ২ সেপ্টেম্বর শুভ শুক্রবার শ্যামনগর উপজেলা সৎসঙ্গ মন্দিরে সাপ্তাহিক সৎসঙ্গ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে সমবেত প্রার্থনাসহ সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠ ও সনাতন ধর্মীয় আলোচনা করা হয়।

* গত ৩ আশ্বিন ১৪২১ বঙ্গাব্দ ১৭ই অক্টোবর শুভ শুক্রবার শ্যামনগর উপজেলা সৎসঙ্গ মন্দিরে সাপ্তাহিক সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সমবেত প্রার্থনা করা হয়। অতঃপর শ্রীশ্রীঠাকুরের অমিয় গ্রন্থরাজি থেকে পাঠ করা হয়। অধিবেশনে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যজীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা করা হয়।

গত ৬ই কার্তিক ২৪শে অক্টোবর শুক্রবার শ্যামনগর উপজেলা সৎসঙ্গ মন্দিরে সাপ্তাহিক অধিবেশন যথারীতি সন্ধ্যা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে শুরু হয় এবং বিশেষ প্রার্থনা ও সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠান্তে সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়।

* ১৩ কার্তিক ৩১শে অক্টোবর শুক্রবার উপজেলা সৎসঙ্গ মন্দিরে সন্ধ্যায় সাপ্তাহিক সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ প্রার্থনা সহ নারীর নীতি সত্যানুসরণ ও গীতা পাঠ করা হয় এবং পাঠান্তে আলোচনা হয়। দুপুর ১২টায় বাদঘাটা নিবাসী দেবীরঞ্জন মন্ডলের গৃহে সৎসঙ্গী ভক্ত ভোজনের আয়োজন করা হয়।

* ২০ শে কার্তিক ৭ই নভেম্বর শুক্রবার উপজেলা সৎসঙ্গ মন্দিরে সাপ্তাহিক সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানগুলিতে পৌরহিত্য করেন– অসিত কুমার মন্ডল এসপিআর, নিশিথ রঞ্জন বৈদ্য ও দেবীরঞ্জন মন্ডল। শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র গ্রন্থ সত্যানুসরণ, পুণ্যপুথি, নারীরনীতি, চলার সাথী, পথেরকড়ি ও পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করেন যথাক্রমে– ধৃতিমান মন্ডল, শিউলি মন্ডল, চন্দনা মন্ডল, নিশিথ বৈদ্য, তপন মন্ডল, দিনেশ চন্দ্র মন্ডল,
আলোচনায় অংশগ্রহন করেন–অরবিন্দ মন্ডল, দেবীরঞ্জন মন্ডল, উত্তমা মন্ডল, তপন কুমার মন্ডল, দিনেশচন্দ্র মন্ডল (প্রভাষক) নিশিথ রঞ্জন বৈদ্য ও অভিষেক মন্ডল (প্রভাষক)
সংগীতে অংশগ্রহণ করেন– সুদেব মন্ডল, শিউলি মন্ডল, উত্তমা মন্ডল, সাধন কর্মকার, নিশিথ রঞ্জন বৈদ্য, তাপস যোয়াদ্দার ও ধৃতিমান মন্ডল।

* ২৭শে কার্তিক ১৪ই নভেম্বর শুভ শুক্রবার শ্যামনগর উপজেলার শৈলখালী নিবাসী ইষ্টপ্রাণ বাবু সহপ্রতিঋত্বিক অমিত কুমার মন্ডলের গৃহে সকাল ১০ ঘটিকায় শ্যামনগর উপজেলা সৎসঙ্গ মন্দিরের পরিচালনায় সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে গৃহস্বামীর মঙ্গলকামনাসহ মানবকল্যাণে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। অতঃপর পবিত্র সত্যানুসরণ পাঠ করেন– বাবু দেবীরঞ্জন মন্ডল। পবিত্র গীতা পাঠ করেন বাবু অমিত কুমার ও ভক্তৃবৃন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যজীবন ও বাণীর উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। অনুষ্ঠান শেষে সৎসঙ্গী ভক্তসেবায় অংশগ্রহণ করেন– বাবু কার্তিক চন্দ্র দত্ত, তপন কুমার মন্ডল, নিশিথ রঞ্জন বৈদ্য, অভিষেক মন্ডল, প্রবীর গায়েন, কালীপদ গায়েন(এসপিআর), অরবিন্দ মন্ডল, দেবলা মন্ডল, অসিম মন্ডল ও দেবী রঞ্জন মন্ডল সহ আরো অনেকে।

যশোর

গত ৪ বৈশাখ ১৪২১ বঙ্গাব্দ শুক্রবার মাগুরাডাঙ্গা(শেরপুর) নিবাসী শ্রীগোবিন্দ প্রসাদ দাস (সহ.প্রঃঋঃ) মহোদয়ের গৃহাঙ্গনে তাঁরই প্রয়াত সহধর্মীনীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে

তাঁরই স্মৃতির উদ্দেশ্যে তাঁরই বিদেহী আত্মার শান্তি কামনার উদ্দেশ্যে শ্রীসন্তোষকুমার দাস মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক সৎসঙ্গ অনুষ্ঠান হয় ।

প্রার্থনান্তে সত্যানুসরণ, শ্রীশ্রীগীতা ও মাতৃমঙ্গল গ্রন্থ থেকে পাঠ করেন যথাক্রমে– শ্রীমোহন দেবনাথ, শ্রীদীনেশচন্দ্র (স.প্র.ঋ) ও শ্রীমতি রীতারাণী দাস ।

এরপর শ্রীসন্তোষ কুমার দাস মহোদয়ের উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আলোচনা সভা শুরু হয় । অধিবেশনে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যজীবন ও বাণীর উপর বক্তব্য রাখেন– শ্রীমতি রীতারানী দাস, শ্রীবিশ্বজিৎ দাস, শ্রীগোবিন্দ কুমার বসু । শ্রীদুলাল চন্দ্র মন্ডল, শ্রীরনজিৎ কুমার দাস, শ্রীসুকুমার কুন্ডু (স.প্র.ঋ.), শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (স.প্র.ঋ.) ও শ্রীসন্তোষ কুমার দাস ।

নড়াইল

গত ১০ বৈশাখ ১৪২১ বঙ্গাব্দ বৃহস্পতিবার বাকলী নিবাসী শ্রীশোভন অধিকারী মহোদয়ের গৃহাঙ্গনে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক সৎসঙ্গ অধিবেশন হয় ।

অধিবেশনে প্রার্থনান্তে সত্যানুসরণ শ্রীশ্রীগীতা ও মাতৃমঙ্গল গ্রন্থ থেকে যথাক্রমে পাঠ করেন– শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সরকার(স. প্র.ঋ), শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (স.প্র.ঋ) ও লিপিকারানী বিশ্বাস ।

এরপর শ্রীভবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (যাজক) মহোদয়ের উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে আলোচনা সভা শুরু হয় । শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য জীবনাদর্শের উপর বক্তব্য রাখেন– শ্রীসুকুমার পাঠক (স.প্র.ঋ.) শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (স.প্র.ঋ.), শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য (স.প্র.ঋ.) শ্রীরঞ্জন কুমার সাহা (স.প্র.ঋ.) ও শ্রীপিন্টু রঞ্জন রায় (স.প্র.ঋ.) সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রীমনোজিৎ হালদার ।

সাতক্ষীরা

গত ১৫ই কার্ত্তিক ২রা নভেম্বর ২০১৪ খ্রী. শুভ রবিবার জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে মধ্য বাদঘাটা জগদ্দাত্রী পূজার শুভ বিজয়া দশমীতে সন্ধ্যা ৬টায় সনাতনী সৎসঙ্গ ও সর্বধর্ম সমন্বয়ে মহতী ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয় ।

সভার শুরুতেই সমবেত প্রার্থনা সহ মানব কল্যাণে বিশেষ প্রার্থনা করা হয় । পবিত্র সত্যানুসরণ পাঠ করেন ধৃতিমান মন্ডল, নারীর নীতি পাঠ করেন– লতা রানী মন্ডল, পবিত্র গীতা পাঠ সহ ব্যাখ্যা করেন– বাবু দেবীরঞ্জন মন্ডল । অমৃত বাণী পাঠ করেন– উত্তমা মন্ডল, অনুষ্ঠানটির পৌরহিত্য করেন– কালী পদ গায়েন, অধিবেশনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাবু নিশিথ রঞ্জন বৈদ্য (শিক্ষক নবীপুর পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়), বাবু দিনেশ চন্দ্র মন্ডল (প্রভাষক মুনসীগঞ্জ ডিগ্রী কলেজ), নিরঞ্জন মন্ডল ধুমঘাট । সর্বধর্ম সমন্বয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যজীবন বাণীর আলোকে জগদ্ধাত্রী পূজা নিয়ে আলোচনা করেন– বাবু অসিত কুমার মন্ডল (স্বাগত বক্তা), উত্তমা মন্ডল, দিনেশ চন্দ্র মন্ডল, গীতা রানী গায়েন, দেবীরঞ্জন মন্ডল ও নিশিথ রঞ্জন বৈদ্য ।

অধিবেশনে সংগীত পরিবেশন করেন– নিশিথ রঞ্জন বৈদ্য, উত্তমা মন্ডল, সুদেব কুমার মন্ডল ও ধৃতিমান মন্ডল । অনুষ্ঠান শেষে প্রাসাদ বিতরণ করা হয় ।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বাবু দেবীরঞ্জন মন্ডল ।

একটুখানি চোখ রাখুন

ইষ্টপ্রাণ দাদা/মায়েরা, সন্দীপনার চলার পথকে সাবলীল করার লক্ষ্যে আপনার বার্ষিক বকেয়া গ্রাহক চাঁদা পরিশোধ করুন । সেই সাথে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন দিয়ে সন্দীপনার কলেবর বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করুন ।

-সম্পাদক

প্রার্থনার সময়সূচি

(বাংলাদেশ সময়ানুসারে প্রাতঃকালীন প্রার্থনা সূর্যোদয়ের ৩০ মিনিট পূর্বে এবং সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনা সূর্যাস্তের সাথে সাথে)

মাসের নাম	তারিখ / সময়	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১
জানুয়ারি	প্রাতঃ	৬.২২	৬.২২	৬.২২	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৩	৬.২২
	সন্ধ্যা	৫.২৮	৫.২৮	৫.২৯	৫.৩০	৫.৩০	৫.৩১	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩৩	৫.৩৪	৫.৩৪	৫.৩৫	৫.৩৫	৫.৩৬	৫.৩৭	৫.৩৭	৫.৩৮	৫.৩৯	৫.৩৯	৫.৪০	৫.৪০	৫.৪১	৫.৪২	৫.৪২	৫.৪৩	৫.৪৪	৫.৪৫	৫.৪৬	৫.৪৬	৫.৪৭	৫.৪৮
ফেব্রুয়ারি	প্রাতঃ	৬.২২	৬.২১	৬.২১	৬.২১	৬.২০	৬.২০	৬.২০	৬.১৯	৬.১৮	৬.১৭	৬.১৭	৬.১৭	৬.১৬	৬.১৬	৬.১৫	৬.১৪	৬.১৪	৬.১৩	৬.১২	৬.১১	৬.১১	৬.১০	৬.০৯	৬.০৮	৬.০৭	৬.০৬	৬.০৬	৬.০৫			
	সন্ধ্যা	৫.৪৯	৫.৪৯	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫১	৫.৫২	৫.৫২	৫.৫৩	৫.৫৪	৫.৫৪	৫.৫৫	৫.৫৫	৫.৫৬	৫.৫৬	৫.৫৭	৫.৫৭	৫.৫৮	৫.৫৯	৫.৫৯	৬.০০	৬.০০	৬.০১	৬.০২	৬.০২	৬.০২	৬.০৩	৬.০৪	৬.০৪			
মার্চ	প্রাতঃ	৬.০৪	৬.০৩	৬.০২	৬.০১	৬.০০	৫.৫৯	৫.৫৮	৫.৫৭	৫.৫৬	৫.৫৫	৫.৫৪	৫.৫৪	৫.৫৩	৫.৫২	৫.৫১	৫.৫০	৫.৪৯	৫.৪৮	৫.৪৭	৫.৪৬	৫.৪৫	৫.৪৪	৫.৪৩	৫.৪২	৫.৪১	৫.৪০	৫.৩৯	৫.৩৮	৫.৩৭	৫.৩৬	৫.৩৫
	সন্ধ্যা	৬.০৫	৬.০৫	৬.০৬	৬.০৬	৬.০৭	৬.০৭	৬.০৮	৬.০৮	৬.০৮	৬.০৯	৬.০৯	৬.১০	৬.১০	৬.১১	৬.১১	৬.১১	৬.১২	৬.১২	৬.১২	৬.১৩	৬.১৩	৬.১৪	৬.১৪	৬.১৫	৬.১৫	৬.১৫	৬.১৬	৬.১৬	৬.১৬	৬.১৭	৬.১৭
এপ্রিল	প্রাতঃ	৫.৩৪	৫.৩৩	৫.৩২	৫.৩১	৫.৩০	৫.২৯	৫.২৮	৫.২৭	৫.২৬	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৩	৫.২২	৫.২১	৫.২১	৫.২০	৫.১৯	৫.১৮	৫.১৭	৫.১৬	৫.১৫	৫.১৫	৫.১৪	৫.১৩	৫.১২	৫.১২	৫.১১	৫.১০	৫.১০	৫.০৯	
	সন্ধ্যা	৬.১৮	৬.১৮	৬.১৮	৬.১৯	৬.১৯	৬.২০	৬.২০	৬.২০	৬.২১	৬.২১	৬.২২	৬.২২	৬.২২	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৬	৬.২৬	৬.২৭	৬.২৭	৬.২৭	৬.২৮	৬.২৮	৬.২৮	৬.২৯	
মে	প্রাতঃ	৫.০৮	৫.০৮	৫.০৭	৫.০৬	৫.০৬	৫.০৫	৫.০৪	৫.০৪	৫.০৩	৫.০৩	৫.০২	৫.০২	৫.০১	৫.০০	৫.০০	৪.৫৯	৪.৫৯	৪.৫৮	৪.৫৮	৪.৫৭	৪.৫৭	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫
	সন্ধ্যা	৬.২৯	৬.৩০	৬.৩০	৬.৩০	৬.৩১	৬.৩১	৬.৩২	৬.৩২	৬.৩৩	৬.৩৩	৬.৩৪	৬.৩৪	৬.৩৫	৬.৩৫	৬.৩৬	৬.৩৬	৬.৩৭	৬.৩৭	৬.৩৮	৬.৩৮	৬.৩৯	৬.৪০	৬.৪০	৬.৪১	৬.৪১	৬.৪১	৬.৪২	৬.৪২	৬.৪২	৬.৪৩	৬.৪৩
জুন	প্রাতঃ	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৭	৪.৫৭	
	সন্ধ্যা	৬.৪৩	৬.৪৪	৬.৪৪	৬.৪৪	৬.৪৫	৬.৪৫	৬.৪৬	৬.৪৬	৬.৪৬	৬.৪৭	৬.৪৭	৬.৪৮	৬.৪৮	৬.৪৯	৬.৪৯	৬.৪৯	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	
জুলাই	প্রাতঃ	৪.৫৭	৪.৫৮	৪.৫৮	৪.৫৯	৪.৫৯	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০১	৫.০১	৫.০২	৫.০২	৫.০২	৫.০২	৫.০৩	৫.০৩	৫.০৩	৫.০৪	৫.০৪	৫.০৪	৫.০৫	৫.০৫	৫.০৫	৫.০৫	৫.০৬	৫.০৬	৫.০৭	৫.০৭	৫.০৮	৫.০৮	৫.০৯
	সন্ধ্যা	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৪৯	৬.৪৯	৬.৪৮	৬.৪৭	৬.৪৭
অগাস্ট	প্রাতঃ	৫.০৯	৫.১০	৫.১০	৫.১১	৫.১১	৫.১২	৫.১২	৫.১৩	৫.১৩	৫.১৩	৫.১৪	৫.১৪	৫.১৪	৫.১৫	৫.১৫	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৯	৫.১৯	৫.১৯	৫.২০	৫.২০	৫.২০
	সন্ধ্যা	৬.৪৬	৬.৪৬	৬.৪৫	৬.৪৫	৬.৪৪	৬.৪৩	৬.৪৩	৬.৪২	৬.৪১	৬.৪১	৬.৪০	৬.৩৯	৬.৩৯	৬.৩৮	৬.৩৭	৬.৩৬	৬.৩৬	৬.৩৫	৬.৩৪	৬.৩৩	৬.৩৩	৬.৩২	৬.৩১	৬.৩০	৬.৩০	৬.২৯	৬.২৮	৬.২৭	৬.২৬	৬.২৫	৬.২৪
সেপ্টেম্বর	প্রাতঃ	৫.২১	৫.২১	৫.২২	৫.২২	৫.২২	৫.২৩	৫.২৩	৫.২৩	৫.২৪	৫.২৪	৫.২৪	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৬	৫.২৬	৫.২৬	৫.২৭	৫.২৭	৫.২৭	৫.২৮	৫.২৮	৫.২৮	৫.২৯	৫.২৯	৫.২৯	৫.৩০	৫.৩০	৫.৩০	
	সন্ধ্যা	৬.২৩	৬.২২	৬.২১	৬.২০	৬.১৯	৬.১৭	৬.১৭	৬.১৬	৬.১৫	৬.১৪	৬.১৩	৬.১২	৬.১১	৬.১০	৬.০৯	৬.০৮	৬.০৭	৬.০৬	৬.০৫	৬.০৪	৬.০৩	৬.০২	৬.০১	৬.০০	৫.৫৯	৫.৫৮	৫.৫৭	৫.৫৬	৫.৫৫	৫.৫৪	
অক্টোবর	প্রাতঃ	৫.৩১	৫.৩১	৫.৩১	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩৩	৫.৩৩	৫.৩৪	৫.৩৪	৫.৩৪	৫.৩৫	৫.৩৫	৫.৩৬	৫.৩৬	৫.৩৬	৫.৩৭	৫.৩৭	৫.৩৮	৫.৩৮	৫.৩৯	৫.৩৯	৫.৪০	৫.৪০	৫.৪১	৫.৪১	৫.৪২	৫.৪২	৫.৪৩	৫.৪৩	৫.৪৪
	সন্ধ্যা	৫.৫৩	৫.৫২	৫.৫১	৫.৫০	৫.৪৯	৫.৪৮	৫.৪৭	৫.৪৬	৫.৪৫	৫.৪৪	৫.৪৩	৫.৪২	৫.৪১	৫.৪০	৫.৩৯	৫.৩৮	৫.৩৮	৫.৩৭	৫.৩৬	৫.৩৫	৫.৩৪	৫.৩৩	৫.৩৩	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩০	৫.২৯	৫.২৯	৫.২৮	৫.২৭	৫.২৭
নভেম্বর	প্রাতঃ	৫.৪৪	৫.৪৫	৫.৪৫	৫.৪৬	৫.৪৭	৫.৪৭	৫.৪৮	৫.৪৮	৫.৪৯	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫১	৫.৫২	৫.৫২	৫.৫৩	৫.৫৪	৫.৫৫	৫.৫৫	৫.৫৫	৫.৫৭	৫.৫৮	৫.৫৯	৫.৫৯	৬.০০	৬.০১	৬.০১	৬.০২	৬.০২	৬.০৩	৬.০৩	
	সন্ধ্যা	৫.২৬	৫.২৬	৫.২৫	৫.২৪	৫.২৪	৫.২৩	৫.২৩	৫.২২	৫.২২	৫.২১	৫.২১	৫.২০	৫.২০	৫.১৯	৫.১৯	৫.১৯	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	
ডিসেম্বর	প্রাতঃ	৬.০৪	৬.০৫	৬.০৫	৬.০৬	৬.০৭	৬.০৭	৬.০৮	৬.০৮	৬.০৯	৬.১০	৬.১০	৬.১১	৬.১২	৬.১৩	৬.১৩	৬.১৪	৬.১৫	৬.১৫	৬.১৬	৬.১৭	৬.১৮	৬.১৮	৬.১৯	৬.২০	৬.২০	৬.২০	৬.২১	৬.২১	৬.২১	৬.২১	৬.২২
	সন্ধ্যা	৫.১৬	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৯	৫.১৯	৫.১৯	৫.১৯	৫.২০	৫.২০	৫.২০	৫.২০	৫.২১	৫.২১	৫.২১	৫.২১	৫.২২	৫.২২	৫.২৩	৫.২৪	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৬	৫.২৭

প্রস্তুতকারক ঃ শ্রীঅসিতকুমার মণ্ডল (সহ-প্রতিঋত্বিক), সহযোগিতায় ঃ শ্রীঅরবিন্দকুমার মণ্ডল (যাজক), সাতক্ষীরা।